সাম্যবাদ

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)'র মুখপত্র

৯ম বর্ষ, ০৩ সংখ্যা, প্রকাশকাল: জুলাই ২০২৩ | web: www.spbm.org | মূল্য ১০ টাকা

বিপ্লবী দল গড়ে তোলার সংগ্রামে নিবেদিত ছিল কমরেড মুবিনুল হায়দারের সমগ্র জীবন

বাংলাদেশের বিপ্লবী আন্দোলনের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, আমাদের প্রিয় নেতা, শিক্ষক ও বাসদ (মার্কসবাদী)'র প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরীর ২য় মৃত্যুবার্ষিকীর স্মরণসভা আজ ১৪ জুলাই, শুক্রবার, বিকাল ৪.৩০টায় জাতীয় প্রেসক্লাবের জহুর হোসেন চৌধুরী মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। পার্টির সমন্বয়ক কমরেড মাসুদ রানার সভাপতিত্বে ও নির্বাহী ফোরামের সদস্য কমরেড রাশেদ শাহরিয়ারের সঞ্চালনায় এতে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় নির্বাহী ফোরামের সদস্য কমরেড তসলিমা আক্তার বিউটি এবং কমরেড জয়দীপ ভট্টাচার্য। আলোচনা পর্বের শুরুতে কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরীর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানান বাসদ (মার্কসবাদী)-এর কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ, দলের গণসংগঠনসমূহ এবং উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ।

কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী ১৯৩৫ সালে ব্রিটিশ শাসনাধীন অবিভক্ত ভারতের চট্টগ্রাম জেলার বাড়বকুণ্ডে জন্মগ্রহণ করলেও শৈশবেই কলকাতার খিদিরপুরে চাকরিরত তার এক ভাইয়ের আশ্রয় চলে যান। সেখানেই ১৯৫১ সালে সোশালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট) সংক্ষেপে এসইউসিআই (সি) এর প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক বিশিষ্ট মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের সাথে তাঁর পরিচয় ঘটে। তিনি কমরেড শিবদাস ঘোষের মার্কসবাদ-লেনিনবাদের যুগোপযোগী বিশেষীকৃত প্রজ্ঞাদীপ্ত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, তাঁর অসাধারণ চরিত্র, শোষিত মানুষের প্রতি অগাধ ভালোবাসা, সকল প্রতিকূলতা অগ্রাহ্য করে বিপ্লবী দল গঠন এবং সংগ্রামে অদম্য দৃঢ়তা ও মনোবল, বিরল সাংগঠনিক শক্তি যতটা ওই বয়সে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন – তাতে গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়ে কমরেড শিবদাস ঘোষকে শিক্ষক ও নেতা মেনে বিপ্লবী আন্দোলনকে জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করেন। ভারতবর্ষে এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) দলের সার্বক্ষণিক কর্মী হিসেবে তিনি শ্রমিক, কৃষক ও ক্ষেতমজুর, ছাত্র-যুবকদের সংগঠিত করেন এবং আন্দোলন গড়ে তোলেন। সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলায় তিনি অসাধারণ যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখেন। কংগ্রেস সরকার বিরোধী নানা আন্দোলনে তিনি বেশ কয়েকবার কারারুদ্ধ হন।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে কমরেড মুবিনুল হায়দার *৭ম পৃষ্ঠায়*

বিদেশি চাপে দেশে গণতন্ত্র আসবে না, দরকার গণআন্দোলন

সামনের জাতীয় নির্বাচনকে ঘিরে দেশে এখন প্রধান রাজনৈতিক প্রশ্ন– জনগণ কি পছন্দমত ভোট দিতে পারবে, নাকি গত দুইবারের মতো একতরফা বা ভোটডাকাতির 'নির্বাচন' হবে? আওয়ামী লীগ সরকার আগের মতোই বা কিছুটা ছাড় দিয়ে সাজানো নির্বাচন করে রাষ্ট্রক্ষমতা ধরে রাখতে চায়। গত দু'টি নির্বাচনে ভোট দিতে না পারা জনসাধারণ চায় একটি নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন। আওয়ামী জোটের দলগুলো বাদে বামপন্থীরাসহ বিরোধী সকল দলগুলোর দাবিও তাই। গত দু'টি নির্বাচনে মানুষ ভোট না দিলেও সরকার নিজে নিজে 'নির্বাচিত' হয়ে এসেছে। তাকে সক্রিয়ভাবে সমর্থন করেছে ভারত ও চীন। পশ্চিমা দেশগুলো কিছু সমালোচনা করলেও শেষপর্যন্ত মেনে নিয়েছে, সরকারের সাথে কাজও করেছে। এ নির্বাচনে পরিস্থিতি কী দাঁড়াবে – এটা দেশের মানুষের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হিসেবে আছে।

জাতীয় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিশ্বসাম্রাজ্যবাদী শিবিরের অবস্থান ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া

এবারের পরিস্থিতি বিগত সময়ের নির্বাচন পূর্ববর্তী পরিস্থিতি থেকে কিছুটা ভিন্ন। বিশ্বসাম্রাজ্যবাদী শিবিরের দ্বন্দ্ব আগের জায়গায় নেই, সেটা আরও তীব্র হয়েছে। বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের মেরুকরণ এখন আরও তীব্র। এর প্রভাব আমাদের জাতীয় রাজনীতিতে আছে। আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি ভিসানীতি ঘোষণা করেছে, যা সরকারকে বেকায়দায় ফেলেছে। কারণ মাঠ পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তাদের দিয়ে সে যেভাবে নির্বাচন সাজাতো, এই নীতি সেক্ষেত্রে একটা পাল্টা চাপ হিসেবে এসেছে। ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থসহ বিভিন্ন কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন বাংলাদেশে অবাধ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের পক্ষে এবার জোরালো অবস্থান নিয়েছে। অপরদিকে রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে বাংলাদেশের রাজনীতিতে পশ্চিমা হস্তক্ষেপের নিন্দা জানানো হচ্ছে। একই সুর চীন এবং ইরানেরও। আওয়ামী লীগ গতবারের মতো ভারতের মাধ্যমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন পাওয়ার চেষ্টা করছে।

ফলে আওয়ামী লীগের পক্ষে আরেকটি ভোটবিহীন কিংবা রাতের ভোটের নির্বাচন সহজ নয়। আরেকটি প্রহসনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা দেশগুলো সরকারকে স্বীকৃতি নাও দিতে পারে। নিষেধাজ্ঞার মুখে পড়তে পারে বাংলাদেশ। শেখ হাসিনা সরকারের ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য রাজনৈতিকভাবে ভারতের সমর্থন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আবার বিনিয়োগ ও অর্থনৈতিক সাহায্যের জন্য চীনের সাথে সম্পর্কও তাদের দরকার। অন্যদিকে বিশ্বপরাশক্তি হিসেবে এবং বাংলাদেশের বৃহত্তম রপ্তানি বাজার ও বিদেশি বিনিয়োগকারী হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে উপেক্ষা করার কোন সুযোগ নেই।

জনগণের ম্যান্ডেট না থাকায় নৈতিক বৈধতার দিক থেকে দুর্বল আওয়ামী লীগ সরকার এই সকল সাম্রাজ্যবাদী দেশের চাপ মোকাবেলা করার জন্য তাদেরকে বিভিন্ন রকম সুবিধা দিয়ে যাচ্ছে। এই সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর চালক মাল্টি ন্যাশনাল কর্পোরেট গোষ্ঠীকে নানা অন্যায় সুবিধা দিয়ে এদেশের জ্বালানি ও সেবাখাত ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। আরও সুবিধা দেয়ার জন্য সরকার দাঁড়িয়ে আছে। দেশের সর্বোচ্চ ক্ষতি স্বীকার করে হলেও আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকার প্রশ্নে অনড়। তাই সুবিধা দিয়ে এই দেশগুলোর সমর্থন চায় সরকার। *২য় পৃষ্ঠায়*

দুই সপ্তাহের মধ্যে পাশ হওয়া তিনটি গণবিরোধী আইন

সরকার আগামীতে জনগণের উপর নির্ভর করে ক্ষমতায় যেতে পারবে না। তাই জনগণের প্রতি তার কোন দায়বদ্ধতা নেই। তাকে যারা সকলদিক থেকে সহযোগিতা দিয়ে ক্ষমতায় রেখেছে সেই ব্যবসায়ী-পুঁজিপতিদের কাছেই তার সমস্তরকম দায়বদ্ধতা। বৃহৎ ব্যবসায়ীদের হাতে দেশের সকল সম্পদ তুলে দেয়া, আর জনবিক্ষোভ নির্মমভাবে নিয়ন্ত্রণ – রাষ্ট্রের সমস্ত আইন ও বিধিবিধান এজন্যেই তৈরি করা হয়। সম্প্রতি পাশ হওয়া এই আইনগুলো তার স্থূল নজিরমাত্র।

১. গত ২১ জুন, ২০২৩ সালে 'ব্যাংক কোম্পানি সংশোধন বিল-২০২৩' সংসদে পাশ হলো। এতে খেলাপিদেরও ঋণ নেয়ার সুযোগ তৈরি করে দেয়া হলো। আগে গ্রুপভুক্ত একটি প্রতিষ্ঠান খেলাপি থাকলে অন্য প্রতিষ্ঠানগুলো ঋণ পেতো না। এই আইনে সেই বাধা তুলে দেয়া হলো। অর্থাৎ লুটপাটকারীদের সুবিধা করে দেয়া হলো। এটা কতখানি জনস্বার্থবিরোধী এবং অসংগত তা বোঝার জন্য একটি উদাহরণই যথেষ্ট। এই প্রস্তাব প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত একটি ব্যাংকের চেয়ারম্যান নাম প্রকাশ না করার শর্তে দৈনিক প্রথম আলোকে বলেন, "আমরা শুধু পরিচালকদের মেয়াদ ৯ থেকে ১২ বছর করার জন্য চেষ্টা করেছিলাম। লিখিত প্রস্তাবে আরও কিছু দিতে হয়, এ জন্য খেলাপিদের ঋণের সুযোগ দেওয়ার প্রস্তাবটি যুক্ত করা হয়েছিল। এটাও পাস হয়ে যাবে, সেটা ভাবিনি। এটা ব্যাংক খাতের জন্য ক্ষতির কারণ হলো।'

২. এর দুই সপ্তাহের মধ্যেই, ৪ জুলাই ২০২৩ গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ (আরপিও)- এর সংশোধনী বিল পাশ হয়। প্রায় দুই যুগ আগে সংযোজিত আরপিও-১৯৭২ এর ৯২(ক) ধারায় যেসব পরিবর্তন আনা হয়েছে তাতে নিশ্চিতভাবেই নির্বাচনের উপর নির্বাচন কমিশনের নিয়ন্ত্রণ দুর্বল হবে। এই ধারায় আগে 'নির্বাচন' শব্দটিকে এখন 'পোলিং' শব্দটি দিয়ে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। 'নির্বাচন' কথাটির মধ্য দিয়ে নির্বাচনী প্রক্রিয়ার পুরো সময়টাকে বোঝানো হয়। অর্থাৎ নির্বাচনের প্রস্তুতি, মনোনয়ন দাখিল, প্রচার-প্রচারণা, ভোট গ্রহণ ও নির্বাচন পরবর্তী পরিস্থিতি – এই সবকিছু মিলেই নির্বাচন, একটা পুরো নির্বাচনী প্রক্রিয়া। এর বিভিন্ন ধাপের যেকোনও সময় অনিয়ম ও বিশৃংখল অবস্থা দেখা দিলে নির্বাচন কমিশন কোনও কেন্দ্রে, কয়েকটি কেন্দ্রে, এমনকি কোনও আসনে ভোট গ্রহণ স্থগিত বা নির্বাচন প্রক্রিয়া স্থগিত করতে পারতো। এমনকি অনিয়মের অভিযোগে পুরো আসনের ফলাফল বাতিল করতে পারতো। *২য় পৃষ্ঠায়*

১ম পৃষ্ঠার পর

গণআন্দোলনই চূড়ান্ত

ফলে একথা প্রমাণিত, আওয়ামী লীগ সরকারের অবস্থান নীতিভিত্তিক নয়, দেশ বা জনস্বার্থের চাইতে নিজেদের গোষ্ঠীগত সুবিধা আদায়ই তাদের মূল বিবেচ্য।

সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর মুখে গণতন্ত্রের স্লোগান কেন

এই বিষয়টির সাথে যুক্ত করে আরেকটি ব্যাপার বোঝা দরকার। যুক্তরাষ্ট্র কিংবা ইউরোপিয়ান সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর মুখে বাক স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের কথা, এই প্রশ্নে বাংলাদেশ সরকারের উপর তাদের চাপ প্রয়োগ – এই বিষয়গুলো দেখে একথা ধরে নেয়ার কোন কারণ নেই যে, এরা বাক স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের পক্ষের শক্তি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাক স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের কথা বলে বলেই সকল রকম সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বিভিন্ন দেশের উপর চাপিয়ে দিয়েছে, লক্ষ লক্ষ মানুষকে উদ্বাস্তু করেছে, নিহত আর আহত হয়েছে অসংখ্য মানুষ। ফলে বাক স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র এই সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর চেতনা নয়, এটি তাদের পররাষ্ট্রনীতি কার্যকর করার কৌশল। তারা তাদের প্রয়োজনে যে কোন অনির্বাচিত সরকারকে সমর্থন করতে পারে, নির্বাচিত সরকারকে সরিয়ে দেয়ার সকল রকম চক্রান্ত করতে পারে। আজ তাদের প্রয়োজন বাংলাদেশের গণমানুষের আকাঙ্খার সাথে মিলে যাচ্ছে, এটা গণআন্দোলনে খানিকটা সুবিধা দিতে পারে। কিন্তু এটা মনে করা ঠিক হবে না যে, ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলনে, সত্যিকারের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে তারা আমাদের বন্ধু। সাম্রাজ্যবাদীরা চূড়ান্ত মাত্রায় ফ্যাসিবাদী এবং শেষ পর্যন্ত গণতন্ত্রের চূড়ান্ত বিরোধী, এরা কখনই গণতন্ত্রের ও মানবতার বন্ধু হতে পারে না।

আবার এই সময়ে গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের স্লোগানটির বিশেষ তাৎপর্য আছে। আমেরিকার বর্তমান বাইডেন সরকার তার পররাষ্ট্রনীতিতে 'গণতন্ত্র' ও 'মানবাধিকার'– এই দু'টিকে মূল এজেন্ডা হিসেবে নির্ধারণ করেছে। চীন-রাশিয়ার সাথে মার্কিন নেতৃত্বাধীন শিবিরের স্বার্থের দ্বন্দ্বকে তারা আখ্যায়িত করছে কর্তৃত্ববাদ এর সাথে গণতন্ত্রের বিরোধ হিসেবে। এভাবে তারা সাম্রাজ্যবাদের বেঁচে থাকার জন্য চাপিয়ে দেয়া যুদ্ধকে আদর্শিক ছাপ দিচ্ছে। তাদের আন্তর্জাতিক প্রচারমাধ্যম, সাহায্য সংস্থা, মানবাধিকার সংগঠন, নাগরিক সমাজ, বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলো প্রাণপণ কাজ করে যাচ্ছে এর পক্ষে মতাদর্শিক বাতাবরণ তৈরি করার জন্য।

বাংলাদেশকে ঘিরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চলে প্রভাব বিস্তারে চীন-ভারত-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পারস্পরিক প্রতিযোগিতা দীর্ঘদিনের। এইক্ষেত্রে ভূ-রাজনৈতিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশের অবস্থান গুরুত্বপূর্ণ। ফলে বাংলাদেশের বিষয়ে মার্কিন মনোযোগ বাড়ছে। প্রধান অর্থনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী চীনকে কোণ-ঠাসা করার জন্য এ অঞ্চলে বাংলাদেশকে নিজের বলয়ে রাখতে চায় আমেরিকা। এ লক্ষ্যে ইন্দো-প্যাসিফিক স্ট্রাটেজি, কোয়াড ইত্যাদিতে যুক্ত হওয়া এবং জিমোসিয়া-আকসা ইত্যাদি সামরিক সহযোগিতা চুক্তি করতে বাংলাদেশের সাথে আমেরিকা আলোচনা চালাচ্ছে। মার্কিন সরকার দুই ধরনের কাজই করছে। তারা আওয়ামী লীগ সরকারের সঙ্গে একদিকে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক ও সহযোগিতা রক্ষা করছে, অন্যদিকে নিরপেক্ষ নির্বাচনসহ গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের প্রশ্নে চাপও দিচ্ছে। তাদের লক্ষ্য আওয়ামী লীগ ও বিএনপি উভয়ের মধ্যে একটি নিরপেক্ষ অবস্থান বজায় রাখা এবং এদেশের জনগণসহ সমাজে প্রভাব-বিস্তারকারী বিভিন্ন মহলের কাছে ইতিবাচক ভাবমূর্তি ও গ্রহণযোগ্যতা গড়ে তোলা।

সাম্রাজ্যবাদী চাপের মাধ্যমে দেশে গণতন্ত্র আসবে না, দরকার গণআন্দোলন

এই পরিস্থিতি কোনদিকে এগোবে এটা নির্ধারণ কে করবে? মার্কিন ভিসানীতি, র‍্যাবের ওপর স্যাংশন বা গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের জন্য পশ্চিমা চাপ ইত্যাদির কিছুটা ইতিবাচক প্রভাব সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে নিশ্চয় পড়বে, কিন্তু সেটা নির্ধারক নয়। এর ফলেই শাসকগোষ্ঠীর চরিত্র পাল্টে যাবে, দেশে অবাধ নির্বাচন নিশ্চিত হবে, গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরে আসবে বা মানবাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে এমন নয়। তার জন্য চাই দেশে শক্তিশালী গণতান্ত্রিক আন্দোলন, জনগণের বিভিন্ন অংশের সক্রিয় প্রতিরোধ। মানুষের সামনে নেতৃত্ব দেয়ার মত যথার্থ গণতান্ত্রিক শক্তির অনুপস্থিতি বর্তমান সময়ে সবচাইতে বড় সমস্যা। সেই শক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে বর্তমান পরিস্থিতিতে গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে কিভাবে অগ্রসর করা যায় তা সবার ভাবা দরকার। অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য নিরপেক্ষ নির্বাচনকালীন সরকার প্রতিষ্ঠার দাবিতে যার যার অবস্থান থেকে সকল গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল, সংগঠন, নাগরিক সমাজ ও জনসাধারণের সোচ্চার হওয়া এবং আন্দোলন জোরদার করা দরকার।

পাশাপাশি এদেশের মানুষ বারবার অভিজ্ঞতায় দেখেছে, শুধুমাত্র নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতার পরিবর্তনই গণতান্ত্রিক শাসন বা জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার নিশ্চয়তা দেয় না। স্বাধীনতার পর থেকে গত ৫২ বছরে পালাক্রমে রাষ্ট্রক্ষমতায় থাকা আওয়ামী লীগ-বিএনপি-জাতীয় পার্টি-জামায়াত, সামরিক বাহিনী-দু-র্নীতিবাজ আমলাগোষ্ঠী-লুটেরা ব্যবসায়ী চক্র কেউই গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের চর্চা বা জনস্বার্থ রক্ষা করেনি। ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে দেশের মানুষকে শোষণ করে এরা সম্পদের পাহাড় গড়েছে, সেই অর্থ আবার বিদেশে পাচার করেছে। রাজনীতির নামে এই নীতিহীনতা, প্রতারণা ও লুটপাটতন্ত্র জনগণকে রাজনীতিবিমুখ ও দেশের ভবিষ্যত সম্পর্কে আশাহীন করে তুলেছে। কিন্তু শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের হতাশা ও নিষ্ক্রিয়তা পরিস্থিতিকে আরো অবনতির দিকে নিয়ে যাবে। কোন মহাপুরুষ বা বিদেশিরা এসে সমস্যার সমাধান করে দেবে না, সমাজের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার মৌলিক পরিবর্তন চাইলে শোষিত-নিপীড়িত মানুষকেই নিজেদের পক্ষের রাজনৈতিক শক্তি গড়ে তুলতে হবে। জনগণের প্রতি দায়বদ্ধ বামপন্থী-গণতান্ত্রিক দল, সংগঠন ও ব্যক্তিবর্গের সেই লক্ষ্যে এগিয়ে আসা দরকার।

১ম পৃষ্ঠার পর

গণআন্দোলন-ছাত্র

আস্থা থাকতে পারে না। তাই, আমি এই কথাটার ওপর জোর দিতে চাই যে, আন্দোলন গড়ে তোলার দিকে দৃষ্টি রেখে যদি সমস্ত সমস্যাগুলোকে বিচার করা যায়, তাহলে নৈতিক অধঃপতনের প্রশ্নটি, সংস্কৃতিগত নিম্নমানের প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যা আমাদের নৈতিক মেরুদণ্ডকেই ভেতর থেকে খেয়ে নিচ্ছে এবং তা রাজনৈতিক নীতি ও আদর্শেরও যা প্রাণসত্তা তাকে নষ্ট করে দিচ্ছে, পেছন থেকে তার সর্বনাশ করে চলেছে।"

আমি কমরেড শিবদাস ঘোষের যে উক্তিটি এখানে তুলে ধরলাম, আমাদের দেশের প্রেক্ষিতে এই কথাটিকে বিচার করলে তাঁর বক্তব্যের যথার্থতা ও কার্যকারিতা আপনাদের সামনে মূর্ত হবে। আমাদের দেশেও নীতি-নৈতি-কতার এই সংকট দেশের গণআন্দোলন গড়ে তোলার পথে সবচেয়ে বড় বাধা। মানুষকে শুধু তার অভাব-দারিদ্র দেখিয়ে ক্ষেপিয়ে তুললেই আন্দোলন হয় না, জনগণের মধ্য থেকে উচ্চ নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও বিবেক-বোধসম্পন্ন দীর্ঘস্থায়ী লড়াইয়ের উপযুক্ত সৈনিক বের করতে হয়। সেটি করে গণআন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী বিপ্লবী পার্টি। সেজন্য সেই পার্টিকে ছাত্রদের মধ্যে, কৃষকদের মধ্যে, শ্রমিকদের মধ্যে যাওয়ার জন্য তার গণসংগঠনগুলোকে চরিত্রসম্পন্ন, মূল্যবোধসম্পন্ন, উচ্চ বিবেকবান কর্মীবাহিনী গড়ে তুলতে হয়। এ না করে শুধু এই চাই, ওই চাই বলে বলে কিছু দাবিদাওয়া নিয়ে কিছুদিন পরপর রাস্তায় নামলেই আন্দোলন গড়ে ওঠে না, ওঠলেও টেকে না। আপনাদের ছাত্রআন্দোলনও তেমনি। আপনাদের তো অনেক অভিজ্ঞতা আছে, অনেকবার দেখেছেন। যে ছেলে দুটো নম্বরের জন্য মাস্টারের বাড়িতে প্রতিদিন ধর্ণা দেয়, যে ছেলে একটা চাকরির জন্য নিজের মর্যাদা বিকিয়ে দিতে পারে, যে ছেলে চোখের সামনে মেয়েদের বেইজ্জতি দেখলেও শব্দ পর্যন্ত করে না, দেশের লোকের চরম সংকটের সময়ও যে নিজের ভবিষ্যৎ প্রতিষ্ঠার কথা ভেবে স্থির থাকতে পারে – এই ছাত্রদের দিয়ে আপনারা দেশে কোনো গণআন্দোলন ভাবতে পারেন না। তার নীতি-নৈতিকতা-রুচি-মূল্যবোধ একই রকম রেখে শুধু তার ফি বাড়লো কেন এ নিয়ে তার যে বিক্ষোভ সেটা কাজে লাগিয়ে কিছুদিন তাকে হয়তো সঙ্গে রাখা যাবে কিন্তু এই চরিত্র দিয়ে আন্দোলন হবে না। গণআন্দোলনও হবে না, ছাত্রআন্দোল-নও হবে না। এই কারণেই চরিত্র খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দুনিয়ায় বড় আদর্শসমূহ যখনই সমাজে এসেছে, মানুষের মধ্যে ক্রিয়া করেছে- সকল আদর্শকেই তার পরিপূরক চরিত্র সৃষ্টি করতে হয়েছে। মানুষ প্রথমে চরিত্রকে বুঝেছে, তারপর আদর্শের প্রতি আস্থাবান হয়েছে। আপনাদের কিছুই যদি না থাকে, একেবারে সর্বস্বান্ত অবস্থায় এই চরিত্রকে সম্বল করে যদি আপনারা মানুষের দুয়ারে গিয়ে দাঁড়ান, আমি বলছি, আমাকে বিশ্বাস করুন, আপন-ারা সবই গড়ে তুলতে পারবেন। মিটিংয়ে ক'জন হলো তা নিয়ে ভাববেন না, ক'জন সত্যিকারের বিপ্লবী চরিত্র গড়ে তুলতে পারলেন তার উপরই নির্ভর করবে আগামী দিনে দেশে ছাত্রআন্দোলন এগোবে কিনা।

আপনারা মনে রাখবেন, গোটা দেশ আজ আপনাদের দিকেই তাকিয়ে আছে। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা ব্যতিরেকে আজকের দিনে সমাজপ্রগতির সংগ্রাম এগোতে পারে না। এদেশে এই মহান আদর্শের একমাত্র বাহক আপনারা। আপনাদের অনেক দায়িত্ব। এদেশের লোক ভীরু-একথা কেউ বলতে পারবে না। তারা বারবার রাস্তায় নেমেছে, প্রাণও দিয়েছে। শুধু তাদের রুটি-রুজির দাবিতে প্রাণ দেয়নি। ইয়াসমিন হত্যার প্রতিবাদ করতে গিয়ে দিনাজপুরে ৭ জন যুবক প্রাণ দিয়েছিলো। এভাবে বোনদের বেইজ্জতি দেখে ভাইদের উন্মত্ত ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রাণ দেবার ইতিহাস এদেশে আছে। আপনারা যদি আদর্শের শক্তিতে এই লড়াকু জনতাকে জাগিয়ে তুলতে পারেন, তবে কোনো বিরুদ্ধ শক্তিই একে দমাতে পারবে না। মানব ইতিহাস বারবার এ প্রমাণ রেখে গেছে।

আমরা বামপন্থী শক্তিসমূহের কাছে বারবার আবেদন করছি, আবার করবো, আসুন আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে জনগণের জ্বলন্ত সমস্যাসমূহকে কেন্দ্র করে আন্দোলন গড়ে তুলি। তবে যেকোনো ঐক্য জনগণের জঙ্গি আন্দো-লন গড়ে তোলাকে কেন্দ্র করে হতে হবে, তার স্পষ্ট ঘোষণা থাকতে হবে। সেক্ষেত্রে আমাদের দলকে আপনারা সামনের কাতারেই পাবেন।

বন্ধুগণ, আকাশের অবস্থা ভালো নয়। যেকোনো সময় বৃষ্টি আসতে পারে। ভারতের খ্যাতনামা সঙ্গীতশিল্পী প্রতুল মুখোপাধ্যায় আমাদের আমন্ত্রণে এসেছেন। তিনি মানুষের দুঃখ-ব্যথা-সম্ভাবনা গানের মাধ্যমে চমৎকারভাবে তুলে ধরেন। সেটা তিনি যাতে ঠিকভাবে করতে পারেন তা আমি চাই। তাই আমি আমার বক্তব্য আর দীর্ঘ করছি না। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জেলায় যখন আমি যাব কিংবা কমরেডরা যখন কেন্দ্রীয়ভাবে অনুষ্ঠিত স্কুলসমূহে আসবেন তখন আমি এসব বিষয় বিস্তারিতভাবে আলোচনা করতে পারব। আজ আমার বক্তব্য আমি এখানেই শেষ করছি।

১ম পৃষ্ঠার পর

গণবিরোধী আইন

কিন্তু এখন 'নির্বাচন' শব্দটির স্থলে 'পোলিং' শব্দ যুক্ত করায় ভোট গ্রহণের দিনের আগে কোন অনিয়ম বা বিশৃঙ্খলা দেখা দিলেও কমিশন এর বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিতে পারবে না। আর ভোট গ্রহণের দিনও কোনো অনিয়ম, জালিয়াতি বা বিশৃঙ্খলার প্রেক্ষিতে পুরো আসনের নির্বাচন স্থগিত বা ফলাফল বাতিল করতে পারবে না। শুধু যে কয়টি ভোট কেন্দ্র থেকে অভিযোগ আসবে সে কয়টি কেন্দ্রের নির্বাচন স্থগিত করতে পারবে।

এমনিতেই নির্বাচন কমিশন সরকারের আজ্ঞাবহ। তারপরও এর যতখানি ক্ষমতা আছে এই সংশোধনীর মধ্য দিয়ে তা ব্যাপকভাবে হ্রাস করা হলো। অর্থাৎ আওয়ামী লীগ সরকার আরেকটি সাজানো নির্বাচনের ছক সামনে রেখেই আরপিও সংশোধন করেছে।

৩. একইদিনে আরেকটি বিল সংসদে পাশ হয়। সেটি হলো 'সরকারি চাকরি সংশোধনী বিল ২০২৩'। এই আইন অনুসারে – স্বশাসিত সংস্থা, রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত কর্মচারীদের বিরুদ্ধে 'দায়িত্ব পালনের সঙ্গে সম্পর্কিত' অভিযোগে করা ফৌজদারি মামলার ক্ষেত্রে আদালত অভিযোগ-পত্র গ্রহণ করার আগে তাকে গ্রেফতার করতে হলে সরকার বা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি নিতে হবে। এর পূর্বে সরকারি চাকুরিজীবীদের ক্ষেত্রে এই আইন প্রযোজ্য ছিল। এখন থেকে সরকারি চাকুরিজীবী, স্বশাসিত সংস্থা, রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত কর্মচারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকলেও পুলিশ কোন পদক্ষেপ নিতে পারবে না। নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অনুমতি লাগবে। সরকারি কর্মচারিদের জন্য যখন এই আইন করা হয়, তখনই এ নিয়ে বিতর্ক উঠেছিল।

'আইনের চোখে সবাই সমান' – এটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের একটি মূলমন্ত্র। এ ধরনের বিধান 'আইনের চোখে সবাই সমান' এই ধারণার পরিপন্থী। এই আইন এই সময়ে করার কারণ স্পষ্ট। জনসমর্থনহীন সরকারকে ক্ষমতায় টিকে থাকতে হলে আমলাতন্ত্র ও পুলিশ প্রশাসনের উপর নির্ভর করা ছাড়া কোন উপায় নেই। আমলাতন্ত্রকে অধিকতর শক্তিশালী করার জন্য (যেন তারা সরকারের পক্ষে সবরকম অনৈতিক কাজ করতে পারে) এই আইন। উপরন্তু এই আইনের সুবিধা নিয়ে সরকারি কর্মচারি ও মাঠপর্যায়ের সায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের কর্মচারিরা বেপরোয়া হয়ে উঠবে। এমনিতেই এই প্রতিষ্ঠানগুলোতে সেবার মান নিম্নগামী; দুর্নীতি, লুটপাটে প্রায় দেউলিয়া। এই আইনের ফলে জনস্বার্থবিরোধী কর্মকাণ্ডে ন্যূনতম বাধাও অপসারিত হবে, জনগণের আইনের (যদিও আইন সবসময় প্রভাবশালীদের স্বার্থেই প্রয়োগ হয়) কোন সুযোগ নেয়ারও উপায় থাকবে না।

সাম্যবাদ
৯ম বর্ষ, ০৩ সংখ্যা, প্রকাশকাল: জুলাই ২০২৩

গণআন্দোলন-ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য চাই উন্নত চরিত্র

কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী

[গত ৬ জুলাই ২০২৩ ছিল বাসদ (মার্কসবাদী)'র প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক, অনন্য সাধারণ বিপ্লবী কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী'র দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকী। তাঁর সংগ্রামী জীবনের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমরা এই বক্তব্যটি প্রকাশ করলাম। বক্তব্যটি সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের মুখপত্র 'অনুশীলন'-এর জুন ২০১৬ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।]

কমরেড সভাপতি, সারাদেশ থেকে আগত ছাত্র ফ্রন্টের প্রতি- নিধিবৃন্দ, মঞ্চে উপবিষ্ট আমাদের দল 'বাসদ (মার্কসবাদী)'-এর নেতৃবৃন্দ, ভারত থেকে আগত ছাত্রনেতৃবৃন্দ- সকাল থেকেই অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ও ছাত্রনেতারা শিক্ষা সম্পর্কিত নানা চিন্তাভাবনা নিয়ে আলোচনা করেছেন। একটু আগে কমরেড শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তীও আলোচনা করলেন। তাই দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় কী কী সংকট বিরাজমান – এসবের বিস্তারিত ব্যাখ্যায় আমি আর যাচ্ছি না।

কেবলমাত্র শিক্ষা নয়, সমস্ত ক্ষেত্রই আজ ভয়াবহভাবে সংকটগ্রস্ত। সমাজ-জীবনের কোনো ক্ষেত্রেই আজ আর বিকাশের সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। এ অবস্থার কারণ কী? দেশের এই অবস্থা বোঝার জন্য প্রথমত রাষ্ট্রের চরিত্র বোঝা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বোঝা দরকার কোন সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বলবৎ থাকার কারণে দেশের সমস্ত ক্ষেত্রই আজ সংকটগ্রস্ত, সমস্ত ক্ষেত্রই আজ বন্ধ্যা। দেশের অবস্থা নিয়ে যারা চিন্তা করেন, সেই শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় সংকটের শত শত দিক নিয়ে আলোচনা করলেও এই মূল বিষয়ে কখনও আলোকপাত করেন না। স্বাধীনতা লাভের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে একটি পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের পত্তন হয়েছে আর এই পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থাই সকল সংকটের কারণ। সকালবেলা অধ্যাপক চৌধুরীও একই কথা বলেছেন। দেশের মানুষের দুঃখ-কষ্ট, ব্যথা, হতাশা – এ সমস্ত কিছুর উৎপত্তি কোথায় তাকে তিনি চিহ্নিত করতে পেরেছেন। আমি এ কারণে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

কমরেড, এই পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থাই দেশের সমস্ত রকম সংকট সৃষ্টির জন্য দায়ী। এ ব্যবস্থায় একদিকে রয়েছে অল্প সংখ্যক পুঁজিপতি-ব্যবসায়ীগোষ্ঠী, অন্যদিকে বিরাট সংখ্যক মেহনতি মানুষ। এই দুই শ্রেণির প্রয়োজন এক নয়। পুঁজি-পতিদের প্রয়োজন আর ব্যাপক শোষিত মানুষের প্রয়োজন পরস্পরবিরোধী। এমন কোনো উন্নতির ধারণা এই সমাজে নেই, যেখানে একই সাথে দুই শ্রেণির কল্যাণ হয়। ফলে দেশ আজ দুইভাগে বিভক্ত। আমাদের দেশে আজ আর অবিভাজ্য কোনো জাতি নেই। তাই মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে না বিপক্ষে – এই প্রশ্ন দিয়ে আমরা আজ আর জাতিকে চিহ্নিত করতে পারি না। আমাদের দেশে একদিকে আছে শোষিত-নির্যাতিত মানুষরা, আর অন্যদিকে আছে সাম্রাজ্যবাদীদের, বিশেষ করে ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদীদের সাথে হাত মিলিয়ে দেশের শোষক পুঁজিপতিরা। তারা

দেশে এক ধরনের পুঁজিবাদী সম্প্রসারণ ঘটিয়েছে। আজকের যুগে শিল্পোদ্যোগ সৃষ্টি করে পুঁজিবাদকে সম্প্রসারিত করার মতো বাস্তবতা বিশ্বের আর কোথাও নেই। বাংলাদেশেও নেই। এ দেশে পুঁজিবাদের বিকাশও সেই পথে ঘটেনি। বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদের বিভিন্ন সংকটের কারণে সস্তা শ্রমের দেশ হিসেবে, সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর আউটসোর্সিংয়ের এক বিরাট ক্ষেত্র হিসেবে এদেশ তৈরি হয়েছে। বাংলাদেশে এভাবেই পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটছে। গ্রাম-শহরের সর্বত্রই রয়েছে এই পুঁজিবাদ। গ্রামের চাষীরা তাদের ফসলের উৎপাদনমূল্যও পাচ্ছে না। আস্তে আস্তে সহায়-সম্পত্তি, ঘর-বাড়ি সবকিছু হারিয়ে এই চাষীরা গ্রাম থেকে উচ্ছেদ হয়ে যাচ্ছে। সর্বহারা হয়ে তারা শহরে আসছে। শহরেও কোনো কাজ নেই। এই সব সর্বস্বান্ত মানুষেরা তখন ভাসমান শ্রমিক হয়ে বিদেশে পাড়ি দিচ্ছে। বৈধ পথে যারা যেতে পারছে না তারা অবৈধ পথে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সাগর পাড়ি দিচ্ছে। কখনও তারা রাস্তায় মারা যাচ্ছে, কখনও মাঝরাস্তায় ধরা পড়ে কোনো দূর দেশের জেলের অন্ধকারেই জীবন পার করে দিচ্ছে। কিছুদিন আগে থাইল্যান্ডের জঙ্গলে গণকবর আবিষ্কৃত হলো। বাংলাদেশ থেকে যাওয়া অনেকের লাশের খোঁজ পাওয়া গেলো। দালালরা তাদের বিভিন্ন দেশে পৌঁছে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছি-লো এবং তাদের কাছ থেকে টাকা নিয়েছিলো। মাঝপথে বাধার কারণে এদেরকে সেখানেই মেরে গণকবর দিয়ে দেয়। এই হচ্ছে দেশের অবস্থা। দেশের গরীব মানুষের গন্তব্য।

আর যারা বৈধ পথেও বিদেশে কাজ করতে যাচ্ছে তারাও প্রকৃতপক্ষে দাস শ্রমিক হিসেবে খাটছে ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে। অথচ সরকার বারবার দেশের উন্নতির ঘোষণা দিয়ে যাচ্ছেন। বাংলাদেশ নাকি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে। দেশের এক কোটি শ্রমিক বিদেশে কাজ করছে। গত দশ বছরে ১৭ হাজার প্রবাসী শ্রমিকের লাশ এসেছে দেশে। প্রতিদিন গড়ে ৮ থেকে ১০ জন শ্রমিকের লাশ আসছে। আর এই মৃত্যুবরণকারী শ্রমিকদের ৮০ শতাংশের বয়সই ৩৯ বছরের নিচে। তাহলে কিসের উন্নয়ন? শিল্পোন্নয়ন হলে কাজ কোথায়? শুধু পেট চালানোর জন্য দেশের যুবকরা জীবন তুচ্ছ করে বিদেশে ছুটছে কেন? দেশের উন্নতি বোঝার জন্য এর থেকে বেশি তথ্য প্রয়োজন কি?

এই হলো পুঁজিবাদী পথে দেশের উন্নতির নমুনা। এই বিরাট সংখ্যক শ্রমিকরা, যারা একসময় দেশের স্বাধীন-তার আন্দোলন করেছিলো, তারা দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার কারণে দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্যে মার খাওয়া অবস্থার সৃষ্টি হলো।

আবার দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় মৌলিক বিষয়গুলো বাদ দিয়ে কারিগরি শিক্ষার ওপর বেশি জোর দেয়া শুরু হলো। কারিগরি শিক্ষার মধ্য দিয়ে মানুষের মধ্যে বিজ্ঞানভিত্তিক, যুক্তিবাদী চিন্তা আসে না। এর মধ্য দিয়ে শুধু কিছু কাজ চালানোর মতো দক্ষ লোক বের হয়। প্রকৃত সেক্যুলার, বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা প্রকৃতি বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়সমূহকে কো-রিলেট করে। যার মধ্য দিয়ে গণতান্ত্রিক, সেক্যুলার চিন্তা-ভাবনার ভিত্তি তৈরি হয়। এর অনুপস্থিতিতে মানুষের মধ্যে যুক্তি ও বিজ্ঞানমনস্কতার বিরুদ্ধে কুসংস্কারাচ্ছন্ন চিন্তার প্রভাব বাড়তে থাকে। ফ্যাসিবাদের জমিন তৈরি হয়। আমাদের দেশে তাই হচ্ছে।

এরই সুযোগ নিয়ে একটি ফ্যাসিবাদী সরকার দেশের মানুষের উপর চেপে বসেছে। আপাত নিরপেক্ষ নির্বাচনের যে আনুষ্ঠানিকতা দেশে ছিল তা এখন আর নেই। পার্লামেন্ট এখন জাদুঘরে পরিণত হয়েছে। চারিদিকে অত্যাচার, নিপীড়ন, লাঞ্ছনা, বঞ্চনা- কিন্তু সেরকম কোনো প্রতিবাদ মূর্ত হচ্ছে না। ফলে একটা বন্ধ্যা, সন্ত্রস্ত, মার খাওয়া অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

এরকম কেন হলো? বিরাট লড়াই-সংগ্রাম করা এ জাতির আজ এই অবস্থা কেন? একদিন দেশের মা-বোনদের উপর ঔপনিবেশিক শাসকদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে দেশের যুবকরা লড়েছে। বৃটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে লড়েছে, পাকিস্তানি শাসকদের বিরুদ্ধে লড়েছে। অথচ দেশ স্বাধীন হওয়ার পর দেখা গেল দেশের নারীদের উপর অত্যাচার-নির্যাতনে সর্বকালের রেকর্ড ভেঙে যাচ্ছে। বিষয়টি এমন নয় যে, যারা লেখাপড়া জানে না, চিন্তা-চেতনায় এখনও সভ্য হয়ে ওঠেনি – বিষয়টি শুধু তাদের মধ্যে ঘটছে। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর হেফাজত – সর্বত্রই নারীরা লাঞ্ছিত, অপমানিত হচ্ছেন। কিশোর-কিশোরীদের বয়ঃ-সন্ধিকাল থেকেই যৌন আকাঙ্ক্ষা উস্কে দেয়া হচ্ছে। একটি জরিপে প্রকাশিত হয়েছে ঢাকা শহরে পর্নোগ্রাফি ব্যবহারকারীদের ৭০ শতাংশই স্কুলের ছাত্রছাত্রী। তারা এসব দেখে, আলোচনা করে, আদান-প্রদান করে। এই ছেলে-মেয়েদের ভবিষ্যৎ কী? প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে লড়াই করেই মানুষ মানুষ হয়েছে, আজ সেই প্রবৃত্তিকেই জীবনের পরম মোক্ষ বলে তুলে ধরা হচ্ছে। এসব কে করছে? করছে শাসকগোষ্ঠী, এই পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার জন্য। আজ এই পুঁজিবাদ একদল বিবেকবর্জিত প্রবৃত্তির দাসত্ব করা মানুষ গড়ে তুলতে চায়। যদিও কোনো পিতা-মাতাই চান না যে তার সন্তান এমন হোক, কিন্তু এটি কারও চাওয়া না চাওয়ার উপর নির্ভর করে না। এটি একটি সামাজিক প্রক্রিয়া। একটি বন্ধ্যা সমাজব্যবস্থা জোর করে টিকে থাকতে চাইলে সমাজের মানুষের নৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে না দিয়ে পারে না। কারণ সর্বস্ব হারানো মানুষ নৈতিকতার উপর, আত্মমর্যাদার উপর ভর করেই লড়াইটা করে। এটুকুও মেরে দিলে সে আর মানুষ থাকে না। তখন সে শুধু জীবন ধারণ করার জন্য সকল প্রকার হীন কাজ করতে পারে। সমাজে এরকম মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া মানে- গণআন্দোলন গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে এ সবচেয়ে বড় সমস্যা। এ বিষয়ে আমাদের শিক্ষা দিয়েছিলেন এ যুগের অন্যতম মার্কসবাদী চিন্তাবিদ ও দার্শনিক, ভারতের এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) পার্টির প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক কমরেড শিবদাস ঘোষ। তিনি বলেছি- লেন, "দেশে চারিদিক থেকে এই যে একটা সর্বাত্মক সংকট দেখা দিয়েছে, তার মধ্যে জনগণ, ছাত্রসমাজ, মজুর-চাষী ও শোষিত জনগণের তরফ থেকে এইসব অন্যায় ও দুর্দশার বিরুদ্ধে কার্যকরী আন্দোলন গড়ে তোলার পরিপ্রেক্ষিতে যদি বিচার করা যায়, তা হলে, আমার মতে, আর্থিক দুর্দশা ও অন্যান্য সংকটের চেয়েও সমাজের মধ্যে নৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের সংকট ও অধঃপতন একটা বিরাট সমস্যার সৃষ্টি করেছে। সমস্ত ক্ষেত্রে এটাই প্রধান সমস্যা- একথা আমি বলছি না। কিন্তু আন্দোলন গড়ে তোলার দিক থেকে এটাই সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। কারণ একটি সঠিক আন্দোলন তো বটেই, এমনকী যে কোন একটা কার্যকরী আন্দোলন দৃঢ়চিত্ততা নিয়ে, একটা মনোবল নিয়ে, সাহসের সাথে একটা পরিকল্পনা নিয়ে, আত্মত্যাগ করবার জন্য প্রস্তুত হয়ে যদি গড়ে তুলতে হয়, তাহলে দেশের মানুষের নীতি-নৈতিকতা ও সংস্কৃতিগত মানের প্রশ্নটি খুব গুরুত্বপূর্ণ।

এই নৈতিক মান ধ্বসে গেলে 'মানুষ মার খেয়েই উঠবে, দাঁড়াবে' – এটা একটা কথার কথায় পর্যবসিত হয়। এ কখনও ঘটে না। 'সংকট দেখা দিলেই আন্দোলন দানা বাঁধবে' – আমাদের দেশে এরকম সব তত্ত্বও প্রচলিত আছে। আপনারা মনে রাখবেন, তা হয় না। না খেয়ে মরবার মতো অবস্থায় পড়ে বা চরম অভাবের মধ্যে পড়ে মানুষ দুটো পথই গ্রহণ করতে পারে। যদি নৈতিকতার একটা মান থাকে তবে সে যেমন আন্দোলনের রাস্তায় পা বাড়াতে পারে, আবার সেই নৈতিকতার মান না থাকলে সে ভিক্ষুক হতে পারে, ভ্রষ্টাচারী হতে পারে, নীতিহীন হতে পারে, ওয়াগন ব্রেকার হতে পারে- কিন্তু আন্দোলনকারী হতে পারে না। খেতে না পেলেই, অভাব থাকলেই, মার খেলেই মানুষ লড়াকু হয়- একথা সত্য নয়।.... মার্কসবাদ-লেনিনবাদ এসব জিনিস মানে না। এরকম স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের তত্ত্বেও মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের কোনো *২য় পৃষ্ঠায়*

কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরীর ২য় মৃত্যুবার্ষিকীতে স্মরণসভা

কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষায় দলের মধ্যে উন্নত সংস্কৃতির সুর তিনিই গেঁথে দিয়েছিলেন

গাজীপুর জেলা শাখার শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন ও আলোচনা সভা

চট্টগ্রাম জেলা শাখার শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন ও আলোচনা সভা

জয়পুরহাটে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন

নীলফামারীতে স্মরণসভায় আলোচনা

কুড়িগ্রামের রৌমারীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন

ফেনী জেলা শাখার শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন ও আলোচনা সভা

নোয়াখালী জেলা শাখায় মুবিনুল হায়দার চৌধুরীর বক্তব্য পাঠ

শেষের পৃষ্ঠার পর

সাত কলেজের

অধিভুক্তির পর থেকে প্রায় ২ লক্ষ শিক্ষার্থী কখনও রুটিন, কখনও রেজাল্ট, কখনও ক্লাসের দাবিতে রাস্তায় আন্দোলন করেছে– ৬ বছর পেরিয়ে গেলেও এখনও এই ৭ কলেজের ব্যাপারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নীতিগত কোন সিদ্ধান্ত নেয়নি। বরং নানাভাবে শিক্ষার্থীদের হয়রানি করা হয়েছে। ফলে শিক্ষার্থীরা সিজিপিএ শিথিল, হয়রানি বন্ধে স্বতন্ত্র প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ, একাডেমিক ক্যালেন্ডার প্রকাশ, ৩ বিষয় পর্যন্ত মানোন্নয়ন পরীক্ষা দিয়ে, ৯০ দিনের মধ্যে ফলাফল প্রকাশ – এই দাবিগুলো নিয়ে আন্দোলনে নামে। অবরোধ করে নীলক্ষেত মোড়। এই অবরোধ চলাকালে ২১ জুন রাত ৯টায় শিক্ষার্থীদের উপর আচমকা হামলা চালায়। বেপরোয়া লাঠিচার্জ করে আহত করে অনেক শিক্ষার্থীকে। গ্রেফতার হন ঢাকা কলেজের ছাত্র ইসমাইল সম্রাট, সরওয়ার্দী কলেজের ছাত্র রনি, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট ইডেন কলেজ শাখার সভাপতি শাহিনুর সুমি, সাংগঠনিক সম্পাদক সুমাইয়া শাহিনা। শিক্ষার্থীদের উপর পুলিশি হামলার সময় তাদের রক্ষা করতে গিয়ে গ্রেফতার হন সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি সাদেকুল ইসলাম ও সাংগঠনিক সম্পাদক মোজাম্মেল হক।

সাত কলেজের শিক্ষার্থীদের এই আন্দোলনে পুলিশি দমন-পীড়ন ও গ্রেফতারের প্রতিবাদে বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলোর জোট 'গণতান্ত্রিক ছাত্র জোট' ক্যাম্পাসে মশাল মিছিল বের করে এবং সিনেট বৈঠক চলাকালে সিনেট ভবন অবরুদ্ধ করে। আন্দোলনের চাপে পরবর্তীতে পুলিশ গ্রেফতারকৃত ছাত্রনেতৃবৃন্দকে ছেড়ে দেয়।

গাইবান্ধায় আলোচনা সভা

ময়মনসিংহে আলোচনা সভা

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির নামে লক্ষ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেয়া 'নুরু-মুক্তি' প্রতারকদের দৃষ্টান্তমুলক শাস্তি ও টাকা উদ্ধারে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে ভুক্তভোগী অসহায় দরিদ্র পরিবারসমূহ ও বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্র গাইবান্ধা শাখার বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল।

শেষ পৃষ্ঠার পর

২৫ হাজার টাকা

১টি পরিবারের সার্বিক খরচ ৪৭,৭৮১ টাকা, 'বিলস' এর গবেষণা মতে ৩৩ হাজার ৩৬৮ টাকা এবং বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনগুলো দেখিয়েছে একটি শ্রমিক পরিবারের সার্বিক খরচ প্রায় ৪৪ হাজার টাকারও বেশি। ৫ বছর পরে আবার ন্যূনতম মজুরি বোর্ড গঠন করেছে সরকার। কিন্তু সেখানে শ্রমিকদের প্রকৃত প্রতিনিধি রাখা হয়নি। আবারও মালিকদের সর্বোচ্চ মুনাফা বজায় রেখে নামমাত্র মজুরি বৃদ্ধির চক্রান্ত চলছে। শ্রমিক সংগঠনগুলোর দাবি, ন্যূনতম মজুরি ২৫ হাজার টাকা ঘোষণা করতে হবে। এই দাবিতে গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন ও গার্মেন্টস শ্রমিক সংগঠনগুলোর জোট 'গার্মেন্টস শ্রমিক অধিকার আন্দোলন' লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে।

সাম্যবাদ
৯ম বর্ষ, ০৩ সংখ্যা, প্রকাশকাল: জুলাই ২০২৩

১০ দফা দাবি বাস্তবায়নে 'বাংলাদেশ ক্ষেতমজুর ও কৃষক সংগঠন'-এর স্মারকলিপি পেশ

উন্নয়ন বাজেটের ৪০% কৃষিতে বরাদ্দ, গ্রামীণ দরিদ্র মানুষদের আর্মি বা পুলিশ যে দামে রেশন পায় একই দামে রেশন দেয়া, বৃদ্ধদের ন্যূনতম মাসিক ৫,০০০ টাকা ভাতা দেয়াসহ ১০ দফা দাবি বাস্তবায়নে বাংলাদেশ ক্ষেতমজুর ও কৃষক সংগঠনের উদ্যোগে গত ৬ জুন দেশব্যাপী জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে ও কেন্দ্রীয়ভাবে অর্থমন্ত্রীকে স্মারকলিপি পেশ করা হয়।

গাইবান্ধা জেলা শাখা

চাঁদপুর জেলা শাখা

রৌমারী উপজেলা, কুড়িগ্রাম

হবিগঞ্জ জেলা শাখা

ডিমলা উপজেলা, নীলফামারী

রংপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে অবস্থান কর্মসূচি

স্বনামে, বেনামে বিত্তবানদের নামে খাসজমির বরাদ্দ বাতিল কর খাসজমিতে ভূমিহীনদের পুনর্বাসন কর

রংপুরের 'ভূমিহীন ও গৃহহীন সংগঠন'– খাসজমি ভূমিহীনদের মধ্যে বরাদ্দ ও তাদের বেঁচে থাকার নানা দাবিকে কেন্দ্র করে দীর্ঘদিন ধরে লড়াই করছে। গত ২০ জুন মঙ্গলবার সংগঠন-টির নেতৃত্বে শত শত ভূমিহীন জনগণ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে অবস্থান কর্মসূচি পালন করে। এ সময় অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ভূমিহীন সংগঠনের প্রধান সংগঠক, বাসদ (মার্কসবাদী) রংপুর জেলার আহ্বায়ক কমরেড আনোয়ার হোসেন বাবলু, আহসানুল আরেফিন তিতু, আনোয়ারা বেগম , আব্দুল মতিন, শাহনাজ বেগম প্রমূখ।

কমরেড আনোয়ার হোসেন বাবলু বলেন, "রংপুর সিটি কর্পোরেশন এবং এর আশেপাশের উপজেলার কয়েক সহস্র ভূমিহীন ও গৃহহীন ছিন্নমূল, ঠিকানাবিহীন পরিবার খাসজমিতে তাদের পুনর্বাসনের জন্য দীর্ঘদিন ধরে দাবি জানিয়ে আসছে। এই পরিবার-গুলো নদী ভাঙ্গনে সর্বস্ব হারিয়ে নিঃস্ব অথবা জন্মগতভাবে ভূমিহীন ও গৃহহীন। এসব পরিবারের বিরাট অংশ সড়ক মহাসড়কের, রেললাইনের পাশে মাটি ভাড়া নিয়ে চালাঘর করে বা ঘর ভাড়া নিয়ে একই ঘরে ১০/১২ জন মিলে থেকে মানবেতর জীবনযাপন করছে। প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা দিয়েছিলেন ২০২২ সালের মধ্যে দেশের সকল ভূমিহীনদের পুনর্বাসন করবেন। এই আশ্বাসে রংপুরের ভূমিহীন-গৃহহীনরাও আশায় বুক বেঁধেছিলো। ভূমিহীন ও গৃহহীন সংগঠন, রংপুরের উদ্যোগে জেলা প্রশাসকের কাছে রংপুর সিটি কর্পোরেশসহ বিভিন্ন উপজেলার ৫ সহস্রাধিক ভূমিহীন পরিবারের তালিকা ভোটার আইডি কার্ডসহ জমা দেওয়া হয়। কিন্তু জেলা প্রশাসক জানান সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ভূমিহীনদের পুনর্বাসনে বাধা আছে। কারণ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় সকল খাস জমি অকৃষি। অকৃষি জমিতে ভূমিহীনদের পুনর্বাসনের সুযোগ নেই। আমরা তখন বলেছিলাম রংপুর সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে একথা খাটে না। কারণ রংপুর সিটি কর্পোরেশনে পুরাতন পৌরসভার সাথে নতুন যে ১৫৩ বর্গকিলোমিটার এলাকা যুক্ত হয়েছে তার পুরোটাই কৃষি জমি। আবার যেসব ভূমিহীন এখানে বাস করে তারা ভ্যান, রিক্সা, অটো চালিয়ে, দিনমজুরি করে, বাসাবাড়িতে ঝিয়ের কাজ করে, নির্মাণ শ্রমিকের কাজ করে, হাসপাতাল, ক্লিনিক, রাস্তাঘাট, ড্রেন পরিষ্কারসহ বিভিন্ন আত্মকর্মসংস্থানমূলক কাজ করে কোনরকমে জীবন চালায়। গ্রামে বছরে তিনমাস কৃষিকাজ ছাড়া অন্য কাজের সুযোগ নেই বললেই চলে। তাই জীবন বাঁচানোর তাগিদে শহরে বসবাসকারী ভূমিহীনদের উপজেলায় ঘরবাড়ির ব্যবস্থা করলে পরিবার পরিজন নিয়ে তাদের না খেয়ে থাকতে হবে। তাই সিটি কর্পোরেশন এলাকায় যে বিশাল পরিমাণ খাসজমি স্বনামে, বেনামে বিত্তবানরা ভোগদখল করছে তাদের কাছ থেকে সেসব জমি উদ্ধার করে ভূমিহীনদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা দরকার। এছাড়া রংপুর শহরের বিভিন্ন পাড়া মহল্লায় 'কালেকটরেট' এর অধীনে অনেক জমি ও বাড়ি রয়েছে, যা সরকারি আমলা ও প্রভাবশালীরা বেনামে ভোগদখল করছে বা জমি কিংবা বাড়ি ভাড়া দিয়ে লাভবান হচ্ছে। ইতিমধ্যে উচ্ছেদকৃত ভূমিহীনদের এসব জমি বা বাড়িতে পুনর্বাসন করা যেতে পারে। এই দাবিগুলো বারবার তোলার পরও সরকার আমাদের কথা কানে তুলছেন না। এই অসহায় মানুষগুলোর প্রতি ন্যূনতম দায়বোধের পরিচয়ও সরকার দিচ্ছে না।"

সভায় ভূমিহীনদের প্রতিনিধিরা তাদের দাবি-দাওয়া তুলে ধরেন। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার আহবান জানান।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা একটি সামগ্রিক জীবনদর্শন

[বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের অন্যতম শিক্ষক ও পথ প্রদর্শক কমরেড শিবদাস ঘোষের জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষে তাঁর চিন্তার সাথে পরিচিত হওয়ার জন্য পাঠকদের উদ্দেশ্যে এ লেখাটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করা হচ্ছে। লেখাটি কলকাতা থেকে প্রকাশিত সাম্যবাদী দৃষ্টিকোণ পত্রিকার এপ্রিল ২০২২ সংখ্যা থেকে সংগৃহীত]
[পূর্ববর্তী সংখ্যার পর]

মার্কসবাদকে ক্রিয়ায় রূপ দিতে হবে জীবনের সকল ক্ষেত্রে

এরই সাথে মনে রাখতে হবে, মার্কসবাদ শেখায়, জানা কথাটার কোনও অর্থ নেই যদি তার সাথে ক্রিয়া যুক্ত না হয়। জগৎকে পরিবর্তন করে উন্নততর স্তরে নিয়ে যেতে আমরা কখনোই পারবো না, যদি আমরা এই সমাজের প্রচলিত মূল্যবোধের প্রভাব থেকে নিজেদের মুক্ত করার সংগ্রাম না করি– অর্থাৎ আগে নিজেদের পরিবর্তন না করি। মার্কস নিজেই সে কথা বলে গিয়েছেন। অর্থাৎ মার্কসবাদের ভিত্তিতে নিজেদের আরও উন্নত কমিউনিস্ট চরিত্রের অধিকারী হতে হবে। জীবনের সকল ক্রিয়ায় মার্কসবাদকে সঠিকভাবে রূপ দেওয়ার মধ্যেই আছে মার্কসবাদকে যথাযথভাবে গ্রহণ করার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য। সেই কারণে, ক্রিয়ার প্রশ্নটি এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই ক্রিয়ার দ্বারাই বোঝা যাবে, মার্কসবাদকে কোনও একজন বিপ্লবী কেবলমাত্র অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক তত্ত্ব হিসাবে গ্রহণ করেছে, নাকি সে জীবনের সকল ক্ষেত্রে বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গীকে উপলব্ধির স্তরে উন্নীত করতে পেরেছে। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের নিয়মগুলির উপলব্ধি-জাত চেতনার দ্বারা যখন কেউ ক্রিয়া করে, তখনই সে মার্কসবাদকে সঠিকভাবে গ্রহণ করার সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। কারণ, মানুষ তার চেতনার ভিত্তিতেই ক্রিয়া করে। এই ক্রিয়া যত বিজ্ঞানভিত্তিক ও বস্তুনিষ্ঠ হয়, ততই তা সামাজিক রূপ পায় এবং সমাজ পরিবর্তনের সহায়ক হয়। মহান মার্কস এই প্রসঙ্গে স্পষ্ট করে দেখিয়েছেন– "...যখন আমি বিজ্ঞান-সম্মতভাবে সক্রিয়... আমার কার্যকলাপ, যা জনসাধারণের অন্যদের সঙ্গে ছাড়া সম্ভব হতে পারে না, সেক্ষেত্রে আমার কার্যকলাপ সামাজিক। কারণ, একজন মানুষ হিসাবে আমি যা সম্পাদন করি এবং আমার কাজের দ্বারা সৃষ্ট বস্তুটি সামাজিক উৎপাদন হিসাবে শুধু আমি পাই তা তো নয়, ...আমার নিজের অস্তিত্বটিও সামাজিক। এবং সেই কারণেই সামাজিক সত্ত্বা হিসাবে আমার সচেতনতার দ্বারা সমাজের জন্যই আমি নিজেই তা তৈরি করি।"১৬

একথা সত্য যে, একজন বিপ্লবীর চেতনা যত ক্ষুরধার হবে, ততই তার ক্রিয়া আরও সুন্দর এবং উদ্দেশ্যমুখীন হবে। উন্নততর ক্রিয়া ও উদ্দেশ্যমুখীনতা চেতনাকে আরও শাণিত করে। এইভাবেই চেতনা ও ক্রিয়া একে অপরকে ক্রমাগত উন্নত করে, শাণিত করে, ক্ষুরধার করে। চেতনা ও ক্রিয়ার এই প্রবহমান দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়াতেই একজন বিপ্লবীর সামগ্রিক মানোন্নয়ন ঘটতে থাকে। এখানে মহান স্ট্যালিনের একটি মূল্যবান শিক্ষা প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন, ক্রিয়াহীন তত্ত্ব বন্ধ্যা, তত্ত্বহীন ক্রিয়া অন্ধ। অর্থাৎ, যে তত্ত্ব ক্রিয়াধর্মী নয়, তা কিছু সৃষ্টি করতে পারে না এবং যে ক্রিয়ার সঙ্গে তত্ত্বের কোনও সংযোগ নেই, তা যুক্তিহীন, অন্ধ। একজন সচেতন বিপ্লবীকে গভীরভাবে এই কথাটি উপলব্ধি করতে হবে। সব সময়ই তত্ত্ব এবং ক্রিয়ার সমন্বয় ঘটাতে হবে। কমরেড শিবদাস ঘোষ এই প্রসঙ্গে বলেছেন, "আমি তত্ত্বকে বলতে চাই সাবজেক্টিভ প্র্যাকটিস আর যাকে আমরা সাধারণত ক্রিয়া বা প্র্যাকটিস বলি তাকে বলতে চাই অবজেক্টিভ প্র্যাকটিস। অর্থাৎ সাবজেক্টিভ প্র্যাকটিস এবং অবজেক্টিভ প্র্যাকটিস দুটো মিলেই দাঁড়িয়ে আছে মানুষের সামগ্রিক ক্রিয়ার ক্যাটাগরি বা পরিধি। সাবজেক্টিভ প্র্যাকটিস অর্থাৎ তত্ত্ব এবং অবজেক্টিভ প্র্যাকটিস অর্থাৎ ক্রিয়া এ দুটোর কর্মধারা ভিন্ন হলেও দুটোই হচ্ছে হিউম্যান প্র্যাকটিস।"১৭ আবার তত্ত্ব এবং ক্রিয়ার যথাযথ সমন্বয় বা সংযোজন অথবা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের উপলব্ধি কীভাবে হয়েছে তা বোঝাতে গিয়ে তিনি নিজেই যেমন বলতেন, "কারোর মধ্যে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের যথার্থ উপলব্ধি ঘটেছে কি না, তা বোঝবার উপায় হল, সেই মানুষটির জীবনে রুচি সংস্কৃতির উচ্চ মান প্রতিফলিত হচ্ছে কি না।" তেমনই এই প্রসঙ্গে মহান মাও সে তুং-এর শিক্ষাকে তুলে ধরে তিনি দেখিয়েছেন, "মার্কসবাদ সম্পর্কে অনেক কথা বলতে পারা বা লিখতে পারার দ্বারা বোঝা যায় না যে কোনও একজন চৌকস জ্ঞানের অধিকারী হয়েছে। আবার মাঠে-ঘাটে মজুর-চাষীদের মধ্যে কাজ করে সংগঠনের অনেক প্রতিভা দেখালেও তার দ্বারা চৌকস জ্ঞান অর্জন করেছে বলা যায় না। চৌকস জ্ঞানের অধিকারী কেউ হয়েছে এটা বলা যাবে এই দুটিকেই দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ায় মেলাতে পারলে, কো-রিলেট করতে পারলে। এখন এই কো-রিলেশন যথার্থ দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে ঘটল কি না অর্থাৎ সত্য সত্যই থিওরি ও প্র্যাকটিস– এই দুটোর যথার্থ মিলন ঘটল কি না এবং মার্কসবাদের চৌকস জ্ঞান অর্জন হলো কি না তা বোঝা যাবে একমাত্র সেই মানুষটির জীবনে রুচি-সংস্কৃতির উচ্চমান প্রতিফলিত হচ্ছে কি না তার দ্বারা– এক কথায় তার জীবনটাই পাল্টে গিয়েছে কি না।"১৮

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারাকে জীবনদর্শন হিসাবে যারা গ্রহণ করবে – তাদের তৃপ্তি ও আনন্দের কাঠামোটাই আলাদা

একজন বিপ্লবীর উপলব্ধি হল, এই সমাজকে পুঁজিবাদী শোষণের জোয়াল থেকে মুক্ত করা। সে উপলব্ধি করছে, ব্যক্তির মুক্তি সমাজমুক্তির সাথে, সমাজবিপ্লবের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সেই উপলব্ধি থেকে নিজেকে ভেঙে নতুন করে গড়ে তোলার প্রয়োজনও সে অনুভব করে। প্রচলিত সমাজের সাফল্য বলতে যা বোঝায় – অর্থাৎ বড় ডিগ্রী, চাকরি, বিপুল অর্থ, তথাকথিত নাম-যশ, প্রশাসনের বড় পোস্ট ইত্যাদি তার কাছে অর্থহীন। এর পরিবর্তে সে একটা নতুন জীবনকে গ্রহণ করেছে। সে বুঝেছে সত্যিকারের মানুষ হওয়ার পথ। এটা সে উপলব্ধি করেছে যে, একজন জীবনে যথার্থ আনন্দ খুঁজে পাবে তখনই, যখন সে তার ক্রিয়ার দ্বারা অপরের জন্য জীবনকে উৎসর্গ করতে পারবে। এই পথেই একজন বিপ্লবীর জীবন সত্যভিত্তিক হয়। আর আজকের যুগসত্য হলো, পুঁজিবাদকে পরাস্ত করে দেশের বুকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সফল করা অর্থাৎ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। সেই কারণেই জীবনের সমস্ত দিককে এই যুগসত্যের পরিপূরক করে গড়ে তুলতে হয়। জীবনের প্রতিটি ক্রিয়াকে বিপ্লবের উদ্দেশ্যমুখীনতা ও সত্যের ভিত্তিতে গড়তে পারলে তা সুন্দর হয়। তাই, কোনও সংগীত, কোনও কবিতা, স্নেহ-ভালোবাসা, মমতা, প্রেম, মাতৃত্ববোধ, পিতৃত্ববোধ, বন্ধুত্ব, রাগ-ঘৃণা সব কিছু যদি বিপ্লবের পরিপূরক হয় এবং তা মানুষকে বিপ্লবের পথে ধাবিত করে, তখনই তা সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়। এই জীবনের জন্যই বিপ্লবীরা সাধনা করে। এই জীবনের জন্য একজন বিপ্লবী সমাজের আমূল পরিবর্তনের প্রয়োজনে ব্যক্তিগত সমস্ত প্রয়োজনকে উপেক্ষা করে এবং করতে পারে।

এই উদ্দেশ্যকে ফলপ্রসূ করতে একজন বিপ্লবী প্রতিটি মুহূর্তে 'বিপ্লব তার কাছে কী প্রত্যাশা করে– সেই চিন্তাই করে এবং সেই অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হয় তার ক্রিয়া।' এর যথার্থ অর্থ হচ্ছে বিপ্লবের প্রয়োজনকে নিজের জীবনে যথার্থ অর্থে স্বীকৃতি দেওয়া। অতীত দিনের বিপ্লবীদের জীবনের উদাহরণ দিয়ে কমরেড শিবদাস ঘোষ আলোচনা করে দেখিয়েছেন, তাঁরা তাঁদের যুগের সমাজ বিপ্লব বা সমাজ পরিবর্তন যা প্রত্যাশা করেছে, তাকেই জীবনে স্বীকৃতি দিয়েছেন। বর্তমান সময়ে ব্যক্তি হিসাবে আমাদের প্রত্যেকের অবস্থান পুঁজিবাদী সমাজে। এই সমাজের পঙ্কিল সংস্কৃতির প্রভাব, বুর্জোয়া-পেটিবুর্জোয়া মানসিকতা থেকে উদ্ভূত চাহিদা, সমাজ অভ্যন্তরের ঘাত-প্রতিঘাতের প্রভাব, চাওয়া-পাওয়ার দ্বন্দ্ব ইত্যাদি একজন বিপ্লবীর জীবনে চলার পথে কখনও কখনও বাধার সৃষ্টি করে বা করতে পারে। তার ফলে জীবন সংগ্রামে নিয়োজিত একজন বিপ্লবীর তেজও কিছুটা স্তিমিত হয়ে পড়তে পারে। কমরেড শিবদাস ঘোষ এই বিষয়গুলো সম্পর্কে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী কী হবে তা দেখিয়েছেন। নিজেদের পরিবারের প্রতি আকর্ষণ, মা-বাবা, সন্তান-সন্ততি, পরিবারের নানান সম্পর্ক, ঘাত-প্রতিঘাত প্রতি মুহূর্তে বিপ্লবী আন্দোলনের পথ থেকে পেছনে টানতে চায়। তার আবর্তে অনেকেই বিব্রত বোধ করেন বা বিচলিত হয়ে পড়েন। কমরেড শিবদাস ঘোষ বিপ্লবী আন্দোলনে নিয়োজিত কর্মীদের কাছে এই প্রশ্ন তুলে ধরলেন যে, "যে পরিবার তোমাকে বিপ্লবের জন্য এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে না, সেই পরিবারের মধ্যে থেকে তুমি কী পাবে? পরিবারের মধ্যে থাকতে থাকতে তাদেরকে যদি তুমি বিপ্লবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে না পারো, তবে সে তো তোমাকে পেছনে টানবেই। এটাই বিজ্ঞান। কেউ কাউকে প্রভাবিত করতে পারছে না– এ হতে পারে না। যদি তুমি তাদের বিপ্লবী আদর্শে অনুপ্রাণিত করতে না পারো এবং তোমার বিপ্লবী দৃঢ়চিত্ততা থাকে, তাহলে তো বেদনাময় বিচ্ছেদ অনিবার্য।"১৯ তাই বলেছেন, "শুধু বাইরে বিপ্লব করলেই তো হয় না। পারি বা না পারি পরিবারের মানুষগুলোকেও তো আমার বিপ্লবী আদর্শ, চিন্তা-ভাবনায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য সংগ্রাম করতে হয়।"২০ মনে রাখতে হবে, ব্যক্তিগত সম্পর্কের বাঁধন, যা বিপ্লবী আন্দোলনে এগিয়ে দেওয়ার পরিবর্তে একজন ব্যক্তিকে পেছনে টানে, তা কখনোই সুন্দর নয়। এই চিন্তার আলোকে প্রত্যেকটি ব্যক্তিগত সম্পর্ককে বিচার করে দেখতে হয়। জীবনের গতিপথে প্রেম-ভালোবাসার প্রশ্ন স্বাভাবিক নিয়মেই এসে যায়। কিন্তু এলেই কি তা গ্রহণ করা যায়? তখন বিচার করতে হয়, 'কোন প্রেম সুন্দর।' যে প্রেম আমাদের বিপ্লবী আন্দোলনে প্রেরণা যোগায়, ভালবাসার পাত্র-পাত্রীকে বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে আত্ম-নিয়োগে নিয়ত উদ্বুদ্ধ করে– তাই সুন্দর। যদি প্রশ্ন আসে, কোন্ কাব্য, কোন্ সাহিত্য, কোন্ সংগীত, কোন্ আড্ডা, কোন্ গল্প, কোন্ কাজ, কোন্ অভিমান, কোন্ রাগ যথার্থ সুন্দর। উত্তর রয়েছে এই দৃষ্টিভঙ্গীতে– আজকের যুগসত্য হিসাবে যে পুঁজিবাদবিরোধী বিপ্লব সমাজ অগ্রগতির সুনির্দিষ্ট পথ, সেই বিপ্লবের পথের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে যা সাহায্য করে, বিপ্লবী জীবনবোধে যা সম্পৃক্ত, একমাত্র তার মধ্যেই রয়েছে সৌন্দর্যের অবস্থান।

বাস্তবিকই, একজন বিপ্লবীর তৃপ্তি এবং আনন্দের কাঠামোটাই আলাদা। পুঁজিবাদী সমাজ এই মননকেই তৈরি করে – আনন্দ হলো শুধু নিজের ভোগ, লাভ আর ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করা। বুর্জোয়া-পেটিবুর্জোয়া চিন্তা কাঠামোর মধ্যে মানুষ নিজের স্বার্থে শুধু পেতে চায়। ব্যক্তিগত জীবনে কী পেল আর কী পেল না, তার হিসেব করে। আর প্রচলিত সমাজের বিরুদ্ধে বিপ্লবী জীবনের আনন্দের ব্যাপ্তি মহৎ ও বিশাল। আনন্দের রূপ তার এই যে, সে বিপ্লবের এই কর্মকাণ্ডে তার সমস্ত শক্তিকে উজাড় করে দিতে পেরেছে। তাই তো তার আরাম নেই, খাওয়া নেই, নিশ্চিত আশ্রয় বলতে কিছু নেই, তবুও সে তৃপ্ত, আনন্দিত, গর্বিত। বিপ্লবী উদ্দেশ্য-মুখীনতার ভিত্তিতেই তার জীবনের সমস্ত ক্রিয়া। এর ভিত্তিতেই তার মূল্যবোধের, তৃপ্তির, আনন্দের কাঠামো। কমরেড শিবদাস ঘোষ বিপ্লবী চরিত্র অর্জনের সংগ্রামের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেছেন, "আমার আনন্দ দরকার বিপ্লবী হওয়ার জন্য। আমার সুখ দরকার বিপ্লবী হওয়ার জন্যই। সুতরাং ভালোবাসা, হৃদয়াবেগ, স্নেহ-মমতা এ সবই দরকার বিপ্লবের অগ্রগতির জন্য।"২১ এই সমস্ত বিষয় প্রখর শ্রেণিদৃষ্টিভঙ্গীর ভিত্তিতেই বিচার করে দেখতে হয়। অর্থাৎ তারাই হলেন যথার্থ বিপ্লবী, যারা হৃদয়বৃত্তির ক্ষেত্রে ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক চিন্তার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রভাব থেকে মুক্ত।

(চলবে)

সাম্যবাদ
৯ম বর্ষ, ০৩ সংখ্যা, প্রকাশকাল: জুলাই ২০২৩

শেষ পৃষ্ঠার পর

ফ্যাসিবাদবিরোধী

বৃহৎ বামপন্থী দলগুলোর মধ্যেও নৈতিকতার সংকট প্রকাশিত হচ্ছে। বাম আন্দোলনের কর্মীদের অনেকেই মনে করেন তত্ত্বগতভাবে রাজনৈতিক পথ নির্ধারণই গুরুত্বপূর্ণ, এর মধ্য দিয়েই দলীয় ঐক্য গড়ে উঠবে। সংস্কৃতিটা ব্যক্তিগত ব্যাপার। সংস্কৃতি যে রাজনীতির প্রতিফলন ঘটায়, এটা তারা মানতে নারাজ। এই ধরনের চিন্তার ফলে কতিপয় দলের নেতা-কর্মীদের মধ্যে উগ্র ব্যক্তিস্বাধীনতার ধারণা, উচ্ছৃঙ্খল জীবন-যাপন, যুক্তি না মানা, নিজের মতে অনড় থাকা, নৈতিক স্খলন– ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য দেখা যাচ্ছে।

এসকল চিন্তাগত বিভ্রান্তি নিয়ে দলের অভ্যন্তরে আদর্শিক তর্ক-বিতর্কের চর্চা ও চর্চার পরিবেশ বেশিরভাগ বামপন্থী দলে নেই। ফলশ্রুতিতে বিভিন্ন মত নিয়ে বিভিন্ন অবস্থান নিয়ে থাকা নেতাদের ঢিলেঢালা সংগঠন, কিংবা কোনরকম আদর্শিক ও সাংগঠনিক তর্ক-বিতর্কহীন যান্ত্রিকভাবে ঐক্যবদ্ধ সংগঠন– এভাবে অনেক বামপন্থী দলই পরিচালিত হচ্ছে। দলের অভ্যন্তরে জ্ঞানচর্চা, আদর্শিক আলোচনা ও দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের ঘাটতি, পুরনো কর্মপ্রক্রিয়া– এসবের ফলাফলে সৃষ্টি হচ্ছে উন্নত রুচি-সংস্কৃতিবিহীন উগ্র কর্মীর দল।

বামপন্থী আন্দোলনে নৈতিকতার সংকটকে গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরেন এ যুগের অন্যতম মার্কসবাদী চিন্তানায়ক ও দার্শনিক, ভারতের এসইউসিআই(সি) দলের প্রতিষ্ঠাতা কমরেড শিবদাস ঘোষ। ভারতের পশ্চিমবঙ্গে যখন বামপন্থী দলগুলো বিরাট শক্তি নিয়ে অবস্থান করে, পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে যখন বামপন্থী দলগুলোর সম্মিলিত যুক্তফ্রন্ট জয়ী হয়ে সরকার গঠন করেছে, যখন দলে দলে তরুণ যুবকরা বামপন্থী দলে যুক্ত হচ্ছে, তখন এই বিরাট জয়ধ্বনির মধ্যে এর দুর্বলতার দিকে তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। ১৯৭৩ সালে প্রদত্ত একটি ভাষণে তিনি বলেছিলেন,“ . . . যে কোনো আদর্শ– তা মার্কসবাদ-লেনিনবাদ হোক, বিপ্লব বা শ্রেণিসংগ্রামের বড় বড় কথাই হোক– সব বড় আদর্শেরই প্রাণসত্ত্বা বা মর্মবস্তু নিহিত থাকে তার প্রভাবে প্রভাবিত মানুষগুলির মধ্যে যে নৈতিক বল এবং নৈতিক চরিত্র গড়ে ওঠে তার মধ্যে এবং তাদের সংস্কৃতিগত মানের মধ্যে। তাই যে কোনো রাজনৈতিক মতবাদই হোক না কেন তার চর্চার মধ্য দিয়ে নৈতিক বল যদি তৈরি না হয়, উঁচু সংস্কৃতিগত মানকে যদি তা প্রতিফলিত না করে তবে সেই আদর্শবাদের তত্ত্বকথা শুনতে যত বড় বলেই মনে হোক না কেন তা শুধু একটা বাইরের কাঠামোমাত্র এবং তা হলো প্রাণহীন দেহের মতো। . . . যদি কোনো রাজনৈতিক মতবাদ ও আন্দোলন নৈতিক বলকে জাগাতে না পারে, সাংস্কৃতিক মানকে উঁচু করতে না পারে তবে মনে রাখবেন, সে রাজনীতি অনিষ্টকর এবং তা অকেজো হয়ে গিয়েছে। তাই যে সব পার্টি মার্কসবাদ-লেনিনবাদের কথা বলছে বা অন্য কোনো আদর্শের কথা বলছে– জটিল তত্ত্ব বিচারের দ্বারা তাদের যথার্থ চরিত্র বিচারের ক্ষমতা যদি নাও থাকে তাহলে এই দিকটি দিয়ে তাদের রাজনীতি প্রকৃতই উন্নত ধরনের ও বিপ্লবী রাজনীতি কিনা তা অতি সহজেই চেনা যায়। এই বিচারের মাপকাঠিটি অত্যন্ত সহজ যেখানে ভুল করার কোনো সম্ভাবনা নেই। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের কথা বলেও যদি কোনো দল নৈতিক বলকে অধঃপতিত করে, দলের কর্মীরা কুসংস্কৃতি-অপসংস্কৃতির শিকার বনে যায়, লারেলাপ্পা কালচারকে প্রতিফলিত করে, কথাবার্তায় ভদ্রতা-শালীনতা না থাকে, আদর্শের সংঘাতকে ভয় পায়, যুক্তি-তর্কের রাস্তা এড়িয়ে গিয়ে গায়ের জোরে অপরকে পদানত করতে চায়, যে কোনো যুক্তির আড়ালেই হোক না কেন কাপুরুষোচিত আক্রমণের প্রবণতাকে প্রশ্রয় দেয়, কর্তব্যকর্মে অবহেলাকে প্রশ্রয় দেয়, তবে হাজার বার দাবি করলেও সে দলের আদর্শ প্রকৃতপক্ষে উন্নত আদর্শ হতে পারে না, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী আদর্শ তো হতেই পারে না।

...অথচ অতীত দিনের ঘটনাবলী কোন্ সত্যকে প্রমাণ করে? বিগত যুক্তফ্রন্টের সময়ে যখন তথাকথিত মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দল সিপিআই(এম)-এর শক্তি সবচেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছিল তখন তাদের কর্মী এবং সমর্থকদের দাপটে দেশের মানুষ ছিল সন্ত্রস্ত। তাদের দলের শক্তিবৃদ্ধি এবং ছাত্র ও যুবসমাজের মধ্যে প্রভাববৃদ্ধির ফলে নৈতিক এবং সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের ওপরে একটা কার্যকরী নিয়ন্ত্রণ হওয়া তো দূরের কথা, সেই সময়েই দেখা গেল ছাত্রদের মধ্যে গণটোকাটুকি একটি আন্দোলনের(!) রূপ পরিগ্রহ করেছে। তাদের প্রভাবিত লোকজনদের মধ্যেই বেশি করে পুলিশ এবং প্রশাসনকে কাজে লাগিয়ে ব্যক্তিস্বার্থে অন্যায় সুযোগসুবিধা নেওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পেল, সামাজিক কর্তব্যবোধ বৃদ্ধি পাওয়ার পরিবর্তে ‘ডিউটি’ (কর্তব্যকর্মে) ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পেল, ভিন্নমতাবলম্বীদের প্রতি আদর্শগত সহিষ্ণুতার মনোভাব গড়ে ওঠার পরিবর্তে অনুকূল পরিবেশে কাপুরুষোচিত আক্রমণের মধ্য দিয়ে তাদের কণ্ঠকে স্তব্ধ করে দেওয়ার হীন প্রবণতা বৃদ্ধি পেল। . . . এই সমস্ত ঘটনা যে সত্যকে প্রমাণ করে তা হলো মার্কসবাদ-লেনিনবাদের নামে তারা যে রাজনীতির চর্চা করছে তা আর যাই হোক না কেন, কোনোমতেই প্রকৃত মার্কসবাদ-লেনিনবাদ নয়। উপরন্তু তারা এদেশে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টি হিসাবে জনগণের কাছে পরিচিত হওয়ায় তাদের উক্ত আচরণ দেখে ছাত্রসমাজ, যুবসমাজ এবং জনসাধারণের একটি অংশের মধ্যে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ সম্পর্কেই গড়ে উঠছে বিভ্রান্তি। তারা যে কেবলমাত্র মার্কসবাদের বুলি আওড়াতে আওড়াতে এবং বিপ্লবের নামাবলী গায়ে দিয়ে অবক্ষয়িত বুর্জোয়া অপসংস্কৃতির শিকার বনে গিয়ে নিজেদের অধঃপতিত করছে তাই নয়, মার্কসবাদের মতো অমন একটা উচ্চ আদর্শকেও এদেশের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ এবং যুবসমাজ ও ছাত্র সমাজের কাছে কালিমালিপ্ত করে দিয়েছে। . . .তাদের প্রভাবে পরিচালিত ছাত্রসমাজের মধ্যে যে মানসিকতা, যুবসমাজের মধ্যে যে মানসিকতা যুক্তফ্রন্টের আমলে বেশি করে প্রতিফলিত হয়েছে তা দেখে ঘরে ঘরে ছাত্র-যুবদের বাবা-মায়েদের থেকে শুরু করে প্রতিটি সাধারণ মানুষ ভেবেছে– ‘সর্বনাশ, এই যদি মার্কসবাদীদের চেহারা হয়, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী হলে যদি পাড়ায় পাড়ায়, কলেজে কলেজে যে মূর্তি দেখতে পাই সেই মূর্তি হয়, তবে এমন মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে শত হস্তে নমস্কার।’ এরই ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে পরবর্তীকালে দেখা গেল সাময়িকভাবে হলেও প্রতিক্রিয়ার দিকে যাবার ঝোঁক।

...সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে যথার্থ আন্দোলন গড়ে তুলতে হলে আপনাদের মনে রাখতে হবে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ একটা বিপ্লবী তত্ত্ব এবং এ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শবাদ, যে আদর্শবাদ ভিয়েতনামের একটি চাষী থেকে শুরু করে একটি শিশুকে পর্যন্ত আমেরিকার নাপাম বোমার বিরুদ্ধে সমস্ত ‘পেটি কন্‌সিডারেশন’ (ক্ষুদ্র স্বার্থবোধ) বিসর্জন দিয়ে লড়াই করার অমিত তেজে খাড়া করে দিয়েছে। এ এমন আদর্শবাদ যে আদর্শবাদকে হাতিয়ার করে চীনের মানুষ স্বাধীনতা অর্জন করল এবং বিপ্লব সফল করল। যে আদর্শবাদের জোরে রাশিয়ার ঘুমিয়ে থাকা চাষী-মজুর বিশ্বে প্রথম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সফল করল, মিলিটারি দিয়ে যাকে পর্যুদস্ত করা গেল না। সেই মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দল যদি সত্যিই সিপিআই (এম) এবং সিপিআই হয়ে থাকে এবং মার্কসবাদী-লেনিনবাদী আদর্শ যদি সত্যিই তারা প্রচার করে থাকে তাহলে তাদের প্রভাবে তো যুবশক্তি নতুন আদর্শের সোনার কাঠির ছোঁয়ায় উন্নততর নৈতিক এবং সাংস্কৃতিক মানকে প্রতিফলিত করবে।”

নীতি-নৈতিকতার গভীর সংকটের এই সময়ে সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে যারা আন্দোলন গড়ে তুলতে চান, যারা বামপন্থী আন্দোলনের কর্মী, এমনকি যারা ফ্যাসিবাদবিরোধী একটা রাজনৈতিক আন্দোলনও গড়ে তুলতে চান, তাদেরকে আমরা এ বিষয়গুলো গভীরভাবে ভাবতে বলব। কোন দল বা জোটের পক্ষে বিপুল সংখ্যক লোক জমায়েত হলেই, তাদের বিরাট জনসমর্থন থাকলেই, কিংবা তাদের উপর রাষ্ট্রীয় নিপীড়ণ থাকলেই তারা যে এই সাংস্কৃতিক সংকট থেকে জনগণকে মুক্তি দিতে পারবে তা নয়। এ প্রসঙ্গে কমরেড শিবদাস ঘোষের আরেকটি উক্তি প্রণিধানযোগ্য, “. . . যখন পশ্চিম বাংলায় যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তখনও আমি এ বিষয়ে বারবার বলার চেষ্টা করেছি। কিন্তু তখন আমাদের কথা কেউ শুনতে চায়নি। বরং আমাদের বিরুদ্ধে সমালোচনা হয়েছে, আমরা নাকি ডিস্‌রাপ্‌টার (বিভেদকামী), আমরা ঐক্য নষ্ট করছি। ঐক্যের স্বার্থে এবং ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের স্বার্থে যখনই কোনও দলের কোনও ক্ষতিকারক দিক সম্পর্কে, দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে আমরা বলতে গিয়েছি তখনই ঐক্যবিরোধী বলে ব্যুয়িং করে, শোরগোল করে আমাদের বসিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। অথচ, সেই ঐক্য গড়ে উঠে কী হল? ঐক্য তো গড়ে উঠেছিল। লক্ষ লক্ষ লোক এখানে সমবেত হয়েছিল। তাদের সমর্থনও যুক্তফ্রন্টের পিছনে ছিল। তা তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ল কী করে। আমার মনে পড়ে, আমি তখনও এই বিপুল জনসমর্থনের নৈতিকতার মানের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলেছিলাম যে, এই হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ লোকের সমর্থন দেখে যাদের মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে, তারা দুনিয়ার ইতিহাসের গতি লক্ষ করেনি। তাদের বোঝা দরকার যে, এই সমর্থনটাই আসল কথা নয়। আসল কথা হচ্ছে, এই বিপুল জনসমর্থনের রাজনৈতিক চেতনার মান, সাংস্কৃতিক মান ও নৈতিক মান কতটুকু? যে মানুষগুলোর সমর্থন আমরা পাচ্ছি সেই মানুষগুলোর নিম্নগামী সংস্কৃতিগত মানের দিকে আমরা এতটুকু লক্ষ রেখেছি? বরং তারা আমাদের সমর্থন করছে বলে, তাদের বিরুদ্ধে কিছু বলতে গেলে আমাদের অসুবিধে হবে বলে তাদের যেকোনও কাজকেই আমরা সমর্থন করেছি।”

ফলে আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী দলের নৈতিক অবস্থান কী, কিভাবে সে দলের নেতা-কর্মীকেই নয়, তার পেছনে আসা সমর্থকগোষ্ঠীকেও সেই মানে উত্তরণের সংগ্রাম করছে – এ বিষয়গুলো গুরুত্ব দিয়ে আজকের সময়ে দেখা দরকার বলে আমরা মনে করি। এ পঁচে যাওয়া সমাজের অভ্যন্তরে যখন কোন দল বা সংগঠন গঠিত হয়, তার মধ্যে নৈতিক ও সাংস্কৃতিক নানা ধরনের সমস্যা আসাই স্বাভাবিক। একটা দল সেটা কীভাবে দেখে, কী ধরনের সাংস্কৃতিক সংগ্রাম দলের অভ্যন্তরে তারা পরিচালনা করে, তাদের সমর্থকদের তারা কিভাবে উন্নত করে– এ বিষয়গুলো আন্দোলনের মাঠে বিচারের বিষয়। না হলে কেবলমাত্র জনসমর্থন ও প্রতিষ্ঠিত নেতাদের দেখে দল বিচার করলে শেষ পর্যন্ত জনগণের জীবনের কোন পরিবর্তন হবে না।

১ম পৃষ্ঠার পর

বিপ্লবী দল গড়ে তোলার

শরণার্থী শিবিরগুলোতে ঘুরে ঘুরে পার্টির পক্ষ থেকে ত্রাণ কার্য পরিচালনা করেন এবং প্রশিক্ষণ শিবিরগুলোতে মুক্তিযুদ্ধের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করেন। এরপর বাংলাদেশ স্বাধীন হলে তিনি মার্কসবাদ-লেলিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার ভিত্তিতে বিপ্লবী দল গঠনের স্বপ্ন নিয়ে স্বদেশে চলে আসেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে শাসক বুর্জোয়াশ্রেণির শোষণের বিরুদ্ধে মুক্তির আকুতি তৈরি হয়। এরই অংশ হিসেবে ছাত্র যুব সমাজ ও জনগণের মধ্যে শোষণমুক্ত ব্যবস্থা তথা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আকুতি সৃষ্টি হয়। অথচ সঠিক পথ দেখাবার মতো কোনো যথার্থ বিপ্লবী দল ও নেতৃত্ব তখন ছিল না। এই পরিস্থিতিতে কমরেড শিবদাস ঘোষের অমূল্য শিক্ষা ও অসাধারণ সংগ্রামের দৃষ্টান্তকে সামনে রেখে কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে এক কঠিন ও কঠোর সংগ্রামে লিপ্ত হন। সেই সময় তাঁর কোন পরিচিতি ছিল না, সঙ্গী-সাথী ছিল না, যোগাযোগ ছিল না, থাকা-খাওয়ার সংস্থান ছিল না। এই অবস্থায় কমরেড শিবদাস ঘোষের বৈপ্লবিক চিন্তা সম্বলিত কয়েকটি পুস্তক হাতে নিয়ে তিনি নানা স্থানে ঘুরেছেন, বিভিন্ন বামপন্থী দলের নেতা-কর্মী ও বুদ্ধিজীবী যাকেই পেয়েছেন তাকেই এইসব পুস্তক দিয়েছেন, নিজের উপলব্ধি অনুযায়ী মার্কসবাদী-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার ভিত্তিতে আলোচনা করেছেন। এই প্রক্রিয়ায় সদ্য সংগঠিত যৌবনোদ্দীপ্ত জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)-এর অনেক নেতৃবৃন্দ, সংগঠক তাঁর রাজনৈতিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং দল গড়ে তোলার আদর্শগত-সাংগঠনিক সংগ্রাম সম্পর্কে তাঁর মাধ্যমে শিক্ষিত হয়ে ওঠেন। এদেরই একটি অংশ পরবর্তীতে জাসদ নেতৃত্বের হঠকারিতা, আপসকামিতা, রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক ভ্রান্তির বিরুদ্ধে দলের অভ্যন্তরে মতাদর্শগত সংগ্রামে লিপ্ত হন। এই নেতা-কর্মীদের নিয়ে তিনি ১৯৮০ সালে প্ল্যাটফর্ম অফ অ্যাকশন হিসেবে বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ) গড়ে তোলেন । মার্কসবাদ- লেলিনবাদ- শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার ভিত্তিতে নতুন করে বিপ্লবী দল গড়ে তোলার এই সংগ্রামের মূল কেন্দ্র ছিলেন কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী।

সর্বহারা নৈতিকতা ও উন্নত রুচি-সংস্কৃতির প্রতীক হিসেবে তাঁর জীবন সংগ্রাম ও আচরণ দলের নেতা-কর্মীদের সামনে অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে সবসময় ছিল। তিনি যখন যেখানে অবস্থান করেছেন, সব সময় নেতা-কর্মী ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে কমরেড শিবদাস ঘোষ সহ মার্কসবাদী অথরিটিদের জীবন ও শিক্ষাকে তুলে ধরেছেন। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ, রাজনীতি অর্থনীতি, ইতিহাস, রুচি-সংস্কৃতি, শিল্প-সাহিত্য, সংগীতসহ জ্ঞান জগতের ও জীবনের সকল সমস্যা সম্পর্কে মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ধরানোর জন্য ক্লান্তিহীনভাবে আলাপ-আলোচনা করেছেন। নিজের হাতে তিনি অসংখ্য বিপ্লবী কর্মী, সমর্থক-শুভানুধ্যায়ী-দরদী তৈরি করেছেন। বাসদ-এর অভ্যন্তরে কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার গুরুত্ব প্রসঙ্গে দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্যসহ বিপ্লবী দল গড়ে তোলার মূলনীতিগত প্রশ্নের মৌলিক পার্থক্য দেখা দিলে ২০১৩ সালের ১২ এপ্রিল কমরেড মুবিনুল হায়দারকে আহ্বায়ক করে ‘বাসদ কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটি’ নামে নতুন দল গঠিত হয় যা পরে কনভেনশনের মাধ্যমে বাসদ (মার্কসবাদী) নাম গ্রহণ করে। আদর্শগত প্রশ্নে পুরনো দলে বাহ্যিক সম্মান, প্রতিষ্ঠা, নিরাপদ জীবন থেকে বেরিয়ে এসে ৮০ বছর বয়সে শূন্য হাতে নতুন করে সংগ্রাম শুরু করার ঘটনা কমরেড মুবিনুল হায়দারের দৃঢ় চরিত্র, উচ্চ মনোবল ও গভীর আদর্শবাদের পরিচায়ক। সামগ্রিকভাবে বলা চলে কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরীর সংগ্রামের ফলে বাংলাদেশে মার্কসবাদের এক সঠিক উপলব্ধি ও জীবনব্যাপী চর্চা এবং বামপন্থী আন্দোলনে এক নতুন ধারা প্রবর্তিত হয়।

কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের মধ্য দিয়ে সভা শেষ হয়। উপস্থিত নেতা-কর্মীরা কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরীর অসমাপ্ত লড়াই এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

সাম্যবাদ

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)'র মুখপত্র

শেষ পৃষ্ঠা

৯ম বর্ষ, ০৩ সংখ্যা, প্রকাশকাল: জুলাই ২০২৩

পোশাক শিল্পের শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি

২৫ হাজার টাকা দিতে হবে

তৈরি পোশাক শিল্প– বাংলাদেশের অর্থনীতির সোনার হরিণ। এই ডলার সংকটের সময়ে সবচেয়ে বড় রপ্তানী খাত, ডলার আয়ের খাত। অথচ এই শিল্পের শ্রমিকরা ধুঁকছে। দাস সমাজের চেয়েও নিকৃষ্টভাবে তাদের খাটিয়ে নেয়া হচ্ছে।

২০১৮ সালে গার্মেন্টস সেক্টরে সর্বশেষ ন্যূনতম মজুরি পর্যালোচনা করা হয়। একজন নতুন শ্রমিকের মূল বেতন নির্ধারণ করা হয় ৪,১০০ টাকা। সাথে বাড়ি ভাড়া হিসেবে ২,০৫০ টাকা, চিকিৎসা ভাতা হিসেবে ৬০০ টাকা, পরিবহন ভাতা হিসেবে ৩৫০ টাকা ও খাদ্য ভাতা হিসেবে ৯০০ টাকা– মোট ৮,০০০ টাকা। সেই সময় কিছু দালাল ট্রেড ইউনিয়ন ছাড়া প্রায় সকল শ্রমিক সংগঠনই এই মজুরি কাঠামো প্রত্যাখ্যান করেছিলো। কিন্তু মালিকরা আর মজুরি বাড়ায়নি।

এই টাকা দিয়েও যে বাজারে চলা যেত না, পাঁচ বছর পর এই বাজারের অবস্থা কী? গত ৫ বছরে চাল ১৫%, ডাল ১০০%, আটা ১০৩%, তেল ১২৬%, লবণ ৬৮%, ডিম ৬৭% এবং চিনি ১৮০% সহ বিভিন্ন পণ্যের মূল্য ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। জ্বালানি তেল, বিদ্যুৎ ও গ্যাসের দামও দফায় দফায় বেড়েছে। অথচ শ্রমিকের মজুরি বাড়েনি। এ সময়ে ওভারটাইম করে, নিজের শরীরের সর্বোচ্চ নিংড়ে দিয়েও শ্রমিকরা দুইবেলা খাবারের সংস্থান করতে পারছে না। গবেষণা প্রতিষ্ঠান 'সিপিডি' দেখিয়েছে *৪র্থ পৃষ্ঠায়*

সাত কলেজের শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে পুলিশের হামলা, গ্রেফতার

সংকট নিরসন না করে আন্দোলন দমন এ আগুন নিভাতে পারবে না

ঢাকার ঐতিহ্যবাহী সরকারি সাত কলেজের শিক্ষার্থীরা আবারও রাস্তায়। আবারও তাদের উপর নেমে এলো পুলিশী নির্যাতন। এর আগে দফায় দফায় ৭ কলেজের শিক্ষার্থীরা আন্দোলনে নেমেছে। আন্দোলন করতে গিয়ে উড়ে গেছে সিদ্দিকুরের চোখ।

২০১৭ সালে *৪র্থ পৃষ্ঠায়*

ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলনে নৈতিকতার সংকট প্রসঙ্গে

দেশের সাধারণ মানুষের তীব্র অর্থনৈতিক সংকট নিয়ে নতুন নতুন উদাহরণ দেয়ার কিছু নেই। এটি প্রতিদিন আরও তীব্র হচ্ছে। আওয়ামী লীগের শাসনে দেশের মানুষ ক্ষুব্ধ। বিক্ষোভ ফেটে পড়ছে প্রতিদিন। সমাজের প্রায় সকল শ্রেণি-পেশার লোকই আওয়ামী শাসনের অবসান চান। বিভিন্ন আন্দোলন-কর্মসূচিও পালিত হচ্ছে বিভিন্ন দল ও জোটের নেতৃত্বে। এর মধ্যে প্রকৃত শক্তি কারা? কারা জনগণের এই জমানো ব্যথাকে মুক্ত করতে পারবে, তাদের প্রত্যাশার রাষ্ট্র বিনির্মাণ করতে পারবে, তাদের চলার পথকে সহজ করতে পারবে?

আন্দোলনকারী বিভিন্ন দলের নেতা-কর্মীরা প্রাত্যহিক জীবনে ও আন্দোলন পরিচালনায় কী ধরনের নৈতিকতার পরিচয় দিচ্ছে– দল বিচারের ক্ষেত্রে সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অনেকে মনে করেন, আন্দোলনটা একটা রাজনৈতিক ব্যাপার। এখানে নৈতিকতা আবার কী? অনেকে আবার পুঁজিবাদী সমাজের প্রয়োজনবাদী দর্শনের শিকার হয়ে এও বলেন যে, নৈতিকতা নিয়ে চিন্তা করলে ক্ষমতা পাওয়া যাবে না। আওয়ামী লীগকে সরানো যাবে না। এসব নিয়ে ভাবলে লড়াই চলে না।

আন্দোলনে নীতি-নৈতিকতার কথা বাজে বকুনি নয়। দেশের অবস্থা কী? প্রাইভেট না পড়লে শিক্ষক মার্কস দিচ্ছেন না, আইনজীবীরা বিচার প্রক্রিয়া প্রভাবিত করার জন্য বিভিন্ন অনৈতিক রাস্তা নিচ্ছেন, চিকিৎসকরা অপ্রয়োজনীয় অপারেশন, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করাচ্ছেন। দেশে এমন কোন সেবা নেই যেটা পেতে হলে নির্ধারিত অর্থের বেশি ব্যয় করতে হয় না বা হয়রানি হতে হয় না। প্রত্যেকটি পেশাই আজ টাকার বিনিময়ে বিক্রির পণ্যে পরিণত হয়েছে। চিকিৎসক, আইনজীবী, শিক্ষক ইত্যাদি মহৎ পেশাগুলোর মর্যাদা প্রায় লুপ্ত হতে বসেছে। প্রতিটি সচেতন মানুষ এই পরিস্থিতিতে অসহ্য হয়ে উঠেছেন। তারা এই অবস্থা থেকে মুক্তি চান। এ কারণেই এই সময়ে এই দুর্নীতির প্রধান ধারক ও বাহক যারা, সিন্ডিকেটের পাহারাদার যারা– তাদের পতন চান। তাই দেখা যাবে এসময়ে যারাই রাজনীতি করছেন, সবাই দুর্নীতিমুক্ত সমাজের স্লোগান দিচ্ছেন। ফলে নৈতিকতার প্রশ্নটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে সামাজিক চাহিদা থেকেই। রাজনৈতিক স্লোগানে এটাই প্রধান। একে এড়িয়ে যাওয়ার কোন উপায় নেই।

যদি তাই হয়, তাহলে আন্দোলনকারী শক্তিগুলোর মধ্যে নৈতিকতার মান কার কতখানি উঁচু, না হলে কেন নয়– সেটা ভেবে দেখার প্রয়োজন নিশ্চয় আছে। সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলোকে খুব বেশি তলিয়ে দেখার সুযোগ না ঘটলেও, দলগুলোর নেতা-কর্মীদের আন্দোলন ও কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ, আন্দোলন পরিচালনা– ইত্যাদি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে তাদের সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যায়। দলের বক্তব্য, প্রোপাগান্ডার ধরন, দলীয় তহবিলের উৎস– ইত্যাদিও দল সম্পর্কে একটা ধারণা দেয়। দলের মধ্যে বড় বড় ব্যবসায়ীদের দৌড়াত্ম, কোটি কোটি টাকায় পদ বিক্রি, নির্বাচনে দলের প্রার্থীতা বিক্রি, সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর দূতাবাসে গিয়ে ধর্না দেয়া, চক্রান্তকারী বিভিন্ন শক্তির সাথে যোগাযোগ, সরকারের কাছ থেকে উপঢৌকন গ্রহণ, নীতিহীন আপোষ– এগুলো সমসাময়িককালে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলনকারী বিভিন্ন শক্তির মধ্যে খোলামেলাই দেখা গেছে। অথচ এও ঠিক অসংখ্য মানুষ বুঝে হউক, না বুঝে হউক এদেরকে সমর্থন করছেন।

বৃহৎ বুর্জোয়া দলগুলো এখন নীতি-নৈতিকতার কথা উচ্চারণ করেন না। ডানপন্থী দলগুলোর মধ্যে ধর্মভিত্তিক দলগুলো ধর্মীয় অর্থে হলেও নীতি-নৈতিকতার কথা বলতেন, এখনও বলেন। এ সময়ে ধর্মভিত্তিক দলগুলোর প্রভাবও বেড়েছে। তাদের সাংগঠনিক শক্তি নিয়ে নানা আলোচনা পত্র-পত্রিকায় এসেছে। সাংগঠনিক প্রভাব বাড়লেও এই শক্তি সমাজে কতটুকু নৈতিক প্রভাব ফেলতে পারছে– ধর্মপ্রাণ মানুষদের আমরা তা ভেবে দেখতে অনুরোধ করব। চুরি-দুর্নীতি না করা, অন্যায় উপার্জন ভোগ না করা– ইত্যাদি ধর্মীয় যে সাধারণ বিধিনিষেধ আছে, সেগুলোও এই দলগুলোর সাথে যুক্ত বিরাট সংখ্যক কর্মী-সমর্থকরা মানছেন কি? তাদের জীবনাচরণ তাদের পাশের মানুষকে প্রভাবিত করতে পারছে কি? বিগত সময়ে যখন ইসলামী বিভিন্ন দলগুলো ক্ষমতার শরিক ছিলেন তখন রাষ্ট্রের দুর্নীতি, লুটপাট, সম্পদ পাচার বন্ধে কী ভূমিকা নিয়েছিলেন– এই প্রশ্ন খতিয়ে দেখলেও তাদের অবস্থান বোঝা যায়।

বুর্জোয়া দল কিংবা ধর্মভিত্তিক দলগুলো নৈতিকতা সম্পর্কিত প্রশ্নের জবাব দিতে পারবে না – এটাই স্বাভাবিক। স্বাধীনতা সংগ্রাম একসময় বীরদের জন্ম দিয়েছিলো। নীতি-নৈতিকতাসম্পন্ন অসংখ্য তরুণের জন্ম দিয়েছিলো। কারণ সেইসময় জাতীয়তাবাদী আদর্শের একটা প্রগতিশীল ভূমিকা ছিল। আজ আর সেটা নেই। আজ দেশের উন্নতি, দেশপ্রেমের কথা যত বলা হচ্ছে ততই দেশের টাকা বিদেশে পাচার বাড়ছে, দুর্নীতি বাড়ছে। একদিন দেশের জন্য যুদ্ধে গিয়েছিল যে তরুণ, সে আজ নিজের দেশে, নিজের জাতির অধঃপতিত দশা প্রত্যক্ষ করছে। সেদিন দেশকে মুক্ত করার লড়াই একটা নৈতিক বোধে তাকে উজ্জীবিত করেছিল। আজ তো সে লড়াই নেই। ফলে দেশপ্রেম-জাতীয়তাবাদ আজ আর মানুষকে নৈতিক বোধে উজ্জীবিত করার ক্ষমতা রাখে না।

ধর্মীয় চিন্তাও সে পথ দেখাতে পারছে না। পুরনো ধর্মীয় ও পারিবারিক মূল্যবোধগুলো নিঃশেষ হয়ে গেছে। ঘটা করে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন বাড়ছে, সাথে সাথে বাড়ছে দুর্নীতি, লুটপাট। যতই যুবক-তরুণদের উপদেশ দেয়া হচ্ছে 'সৎ থাক, ভাল কাজ কর', ততই তারা দ্বিগুণ উৎসাহে অসৎ পথ ধরছে। ফলে আদর্শের ক্ষেত্রে একটা শূণ্যতা বিরাজ করছে। আদর্শিক এই শূণ্যতার ফলাফলই হচ্ছে চূড়ান্ত সাংস্কৃতিক অবক্ষয় ও নৈতিকতার সংকট।

এই পরিস্থিতিতে এর বিরুদ্ধে চরিত্র নিয়ে না দাঁড়ালে সকল প্রতিবাদই সাময়িক কিছু দাবি আদায় করবে, দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন গড়ে তুলতে পারবে না। এই চরিত্র নিয়ে দাঁড়াতে পারে মহান সমাজতন্ত্রের আদর্শে বলীয়ান তরুণ-যুবকরা। সঠিকভাবে মার্কসবাদের চর্চা ও সেই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যুবসমাজের উপর আদর্শগত প্রভাব বিস্তার না করতে পারলে এই শূণ্যতা পূরণ হবে না।

কিন্তু দেখা যাচ্ছে সমাজতন্ত্রের আদর্শধারী *৭ম পৃষ্ঠায়*

সম্পাদক : জয়দীপ ভট্টাচার্য, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)'র পক্ষে শফিউদ্দিন কবির আবিদ কর্তৃক ২২/১ তোপখানা রোড (৬ষ্ঠ তলা), ঢাকা-১০০০ থেকে প্রকাশিত।

ফোন-০২-২২৩৩৫৬৩৭৩। website: www.spbm.org, e-mail: mail@spbm.org